লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে

রোকাইয়া জাফরী

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার - নিউমার্কেট
ঢাকা।

Scanned with CamScanner

LENINER DESHE LALONER MEYE
A Travelogue in Bengali
by
Rokaya Zaffry
Rs. 3·00

প্রকাশক : মোহাম্মদ নাসির আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা। মুদ্রাকর : আবদুল কাদির খান, মুদ্রণী, ৪৬, বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী : প্রাণেশ মণ্ডল। প্রথম সংস্করণ : অগাষ্ট, ১৯৬৬। দাম : তিন টাকা।

লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে

ভূমিকা

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
(পরিচালক, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড)

খ্যাতনামা বাউল কবি লালন শাহ পূর্ব-পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলায় জন্মেছিলেন ; আর বিশ্ববিশ্রুত কম্যুনিষ্ট নেতা লেনিনের জন্ম হয়েছিল রুশ দেশে। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন এক দেশের সাথে আর এক দেশ মিতিলি পাতেনি ;—কারও সাথে কারও দেখাশোনা দূরের কথা, এমন কি, জানাজানিও নেই।

হঠাৎ এ-দেশের একটি মেয়ে রূপকথার মায়াবিনীর মতো রুশ দেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন, আর তিনি সে কথা বই ছাপিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন ;—ব্যাপারখানা জানবার জন্যে মনে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক নয় কি ?

এ-কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যই 'লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে' পড়েছি। দেখলাম, বাউল কবি লালনের দেশের এ-মেয়েটির নাম বেগম রোকাইয়া ! তিনি আমাদের সাহিত্য-জগতে একেবারে অপরিচিতা নন। বেশ কিছুকাল আগে তিনি গল্প লিখতেন। সাঁওতাল নিয়ে লেখা তাঁর একখানা ছোট-গল্প আমার বেশ ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল লেখা তাঁর পেশা নয়,—নেশা। আর, আশ্বস্ত হয়েছিলাম,—এ-নেশা ছাড়ানো যাবে না।

তারপর বেশ কিছুদিন কে'টে গেল। সাহিত্য-জগতে আর তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। দেখলাম, হঠাৎ একদিন রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর উদয় হ'ল। হকচকিত হ'য়ে ভাবলাম,—নেশা ছে'ড়ে পেশায় ঢুকলেন ভদ্রমহিলা ! এ-দুনিয়ায় আশ্চর্য হবার মতো কিছু নেই ;—মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম,—এও তো এক নেশা। আগের ধারণাটা বদলানোর চেষ্টা করা গেল,—ঠিক বদলিয়ে নেওয়া সহজ হ'ল না।

এখন দেখছি, নেহাৎ খারাপ কাজ করিনি। পেশাদারী রাজনীতিতে ঢুকেও ভদ্রমহিলার নেশার ঘোর কাটেনি,—এ তো কম কথা নয় ! তাঁর লেখা 'লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে' এ-নেশার এক নতুন ফসল।

Scanned with CamScanner

সোভিয়েট ইউনিয়নে তাঁর ভ্রমণকে উপলক্ষ করেই এ ফসলের জন্ম। দেখলাম, ছোট্ট একখানা ফসল; তাতে রূপও আছে, রসও আছে; আর আছে মনের মাদকতা;—আত্মসাৎ করতে কষ্ট হ'ল না।

আমাদের দেশে এখন আর বড় ছোট ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অভাব নেই, যেমন অভাব নেই ছোটগল্পের। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিদেশ-গমন ও বিদেশ দেখার সুযোগ হয়েছে অনেকের। তাঁদের সবাই লেখক না হ'লেও মানসিক ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখেছেন অনেকেই। তার কয়েকখানা পড়েওছি। তা কাহিনী বা সাহিত্য হ'য়েছে কিনা, সে অন্য কথা।

হঠাৎ সাহিত্যের কথা এ'ল এ-জন্যে যে, ভ্রমণকাহিনীও এক শ্রেণীর সাহিত্য। এ-সাহিত্যও গল্পের মতো সুকুমার সাহিত্যই। যে ভ্রমণ-কাহিনীতে সৌকুমার্যের পরিচয় নেই, তা ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা হ'তে পারে, বিদেশের তথ্যপঞ্জীও হ'তে পারে; এমন কি, তত্ত্বকথা হ'তেও বাধা নেই। তবে, তা যে সাহিত্য নয়, এ কথা নিশ্চিত। এগুলোকে সাহিত্য বল্লে রেলওয়ে টাইমটেবল এবং দর্শক-দিশারীগুলোকেও সাহিত্যভুক্ত করতে হয়। অথচ, আজও সেগুলোকে কেউ সাহিত্যভুক্ত করেননি।

বেগম রোকাইয়ার 'লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা ভ্রাম্যমাণের রোজনামচা নয়। এ হচ্ছে একটি ভ্রমণ-কাহিনী। বিবৃতি লেখা সহজ, দিনপঞ্জী তৈরিও কঠিন নয়। কিন্তু, কাহিনী বলা যতটা সোজা মনে হয়, ততটা সোজা নয়। এর প্রধান কারণ হ'ল,—যিনি বলিয়ে তাঁর বলার ক্ষমতা থাকা চাই, অর্থাৎ কিনা, তাঁকে স্বভাবদত্ত বাচন-ভঙ্গীর অধিকারী হ'তে হয়। মিষ্টি খাইয়ে মিষ্টিমুখ করা চলে; কিন্তু মিষ্টিকথায় তুষ্ট করতে হলেই বিপৎ। কেননা, তুষ্টির প্রশ্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলে বাহ্য। কথার চাতুর্যে মুগ্ধ করতে হ'লে মনের অতীন্দ্রিয় লোকে প্রবেশ করতে হয়, যিনি বলিয়ে তাঁকে।

আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায়ই 'বিনোদিনী'। গল্প বলা ও গল্প করা তাঁদের একটা স্বভাব। তাঁরা গল্প ব'লে ও গল্প ক'রে নিজেরাও আনন্দ পান এবং অপরকেও আনন্দ দিয়ে থাকেন। তাঁদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব এতেই খুশী। 'লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে'-র লেখিকা, রোকাইয়া আমাদের দেশেরই মেয়ে। জীবনের প্রারম্ভে তিনি

বুঁদ ছিলেন গল্প-সৃষ্টির নেশায়। তাঁর আলোচ্য ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি মেতে উঠেছেন গল্প করার আনন্দে। বোধ হয়, তাইতে তাঁর এ-কাহিনী যথাসম্ভব বিবৃতিবর্জিত ও তথ্যবিহীন; অথচ, এমন এক আনন্দ-উচ্ছল বর্ণনা, পড়বার সময় যা আমাকে আগাগোড়া মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল।

আমাদের দেশের ভ্রমণ-কাহিনীগুলো প্রায়ই পুরুষের সৃষ্টি। একমাত্র বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের 'আমার দেখা তুরস্ক' ছাড়া অন্য কোন লেখিকার কোন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আজও আমার নজরে পড়েনি। 'আমার দেখা তুরস্কে' আর যাই থাক না কেন, রমণীসুলভ গুণের অভাব বড্ড বেশী করেই চোখে পড়ে। লেখিকার নাম বাদ দিয়ে কোন পুরুষের নামে এই বৃত্তান্ত চালিয়ে দিলেও, বইটির বিশেষ অঙ্গহানি হ'ত ব'লে মনে হয় না।

'লেনিনের দেশে লালনের মেয়ে'-র বেলায় এ-কথা বলা চলে না। কাহিনীটির নাম থেকে শুরু ক'রে শেষ পর্যন্ত নারীই যে এতে প্রধান, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। লেখিকা তাঁর কাহিনী বলার ভিতর দিয়ে যে কমনীয় নারী-হৃদয় খু'লে ধরেছেন, যতই তার সংস্পর্শে এসেছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। কারণ, নারী নারীর ভূমিকায় মহিয়সী, আর পুরুষ তার নিজের ভূমিকায় মহৎ। এর দু'-একটা উদাহরণ না দিলে, কথাটা নেহাত কথার-কথা ব'লে মনে হবে। এই ধরুন—

১। ছেলেমেয়েদের কথা স্মরণ ক'রে মনটা দমে যাচ্ছিল। আসার সময় দু'টি শিশুকে রে'খে এত দূরের পথে পাড়ি জমাতে গিয়ে মনের দিক থেকে এখন আর কোন উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। মনের এই ভাব-টাকে প্রকাশ হ'তে দিলাম না—কারণ, মেয়েটা আমার বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল। —পৃষ্ঠা, ৮।

২। এখন যাত্রার সময় হয়েছে। আমি তৈরীই ছিলাম,…নিচে নেমে দরজায় অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠে বসলাম। লক্ষ্য করলাম, গাড়ির ড্রাইভার মহিলা—অবশ্য এদেশে এ-দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। এদেশের মহিলা অত্যন্ত কর্মঠ এবং কর্তব্যপরায়ণা। আমাদের দেশের কাব্যে বর্ণিত 'ললিত লবঙ্গ লতার' মত এরা নয় মোটেই। মেয়েদেরকে এরা সহজভাবেই গ্রহণ করেছে, কাজেই মেয়েরা মানুষের মর্যাদা পেয়েছে। তাই পথে-ঘাটে সর্বত্রই পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি মহিলা কর্মীও নজরে পড়ছে। —পৃষ্ঠা, ৪০।

৩। এত দেশের পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হয়েছে এখানে, অথচ কেউ কারও ভাষা জানে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে, শাড়ি পরিহিতা মহিলা একমাত্র আমিই ছিলাম। তাই, ঘরে প্রবেশ করবার পর থেকেই যে সকলে আমাকে লক্ষ করেছে সেটা বেশ টের পাচ্ছিলাম। আমার কৃষ্ণবর্ণ যে তাদের লক্ষণীয় নয়, সেটা বেশ বোঝা গেল। কারণ, আমার চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ কালো কয়েকজন আফ্রিকান পুরুষ ও মহিলা ঘরের কোণে একটি টেবিল দখল ক'রে বসেছিল; কিন্তু তাদের দিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং ওদের দ্রষ্টব্য যে আমি নই, আসলে আমার শাড়িটাই, তা বুঝতে একটুও দেরী হোল না। —পৃষ্ঠা, ৬১।

৪। পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললাম। রাত্রির স্বাভাবিক নির্জন নীরবতায় নিওন বাতির মাদকতার সঙ্গে ফোয়ারা হ'তে উৎক্ষিপ্ত পানির ঝিরঝির শব্দ অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সুদূরে ফেলে আসা সেই কোন্ ছেলেবেলায় নানী দাদীর কাছে শোনা গল্পের পরীরাজ্যের কথা মনে পড়ে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল, এই পার্কে একটু ব'সে মাদকতার পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো। কিন্তু বৃষ্টিটাই যত অসুবিধার সৃষ্টি করছে। দু'মিনিট দাঁড়ানোর উপায় নেই।—পৃষ্ঠা, ১১২।

মোটের উপর, 'লেনিনের দেশে লালনের মেয়েতে' নারী-হৃদয়ের পরশ যেমন মেলে, নারী-চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধানও পাওয়া যায় প্রচুর। তার একটা প্রধান উদাহরণ মিলছে কাহিনীটির ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায়। এক ভোজসভায় যোগ দিয়ে নাচের অনুষ্ঠানে লেখিকাকে যে নাজেহাল হ'তে হয়, তার কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, তা শুধু নারীর পক্ষেই সম্ভব। এতে তাঁর কোন অহমিকা নেই, ঔদ্ধত্য নেই, অক্ষমতার গ্লানিও নেই; আছে শুধু বঙ্গনারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য সুলভ সলজ্জ ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

এ-কথা বোধ হয় না বল্লেও চলে যে, বেগম রোকাইয়া শুধু গল্প বলতে জানেন না,—গল্প জমাতেও পারেন। তাঁর গল্প বলার বাগভঙ্গি হচ্ছে গল্প করারই বাগভঙ্গী। সাপ-খেলানোর মতো চলতি-কথায় ভাষা খেলানো একটা কঠিন কাজ। এটা দস্তুরমতো একটা আর্ট বা শিল্প। আমাদের অধিকাংশ কাহিনীকার এখানেই মার খায়। এ-শিল্পে বেগম

সাহেবা বেশ পটীয়সী। তাইতে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কাহিনী হয়েই জ'মে উঠেছে,—মুগ্ধ করেছে আমাকে।

যে-ভ্রমণ-কাহিনী আমার মতো বেরসিক লোককেও আনন্দ দিয়েছে, তা যে আরও দশ জনকে আনন্দ দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এ-সৃষ্টি নিরর্থক নয়; কেননা এর পশ্চাতে একটি আনন্দ-ঘন মুহূর্ত সক্রিয়। বেগম সাহেবা আমাদের সাহিত্যে আবার নতুন ক'রে আবির্ভূতা হোন,—আমি তারই প্রতীক্ষা করব উৎসুক মনে।

Scanned with CamScanner

লেখিকা ও প্রেসিডিয়ামের জনৈক সেক্রেটারী

Scanned with CamScanner

অক্টোবর মাসের শেষার্ধ। কদিন থেকেই শীতের হিমেল হাওয়া বারে বারে পৃথিবীকে দোলা দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তার আসন্ন উপস্থিতির বার্তা। এই নবাগত হিমেল হাওয়ার স্পর্শ ভাল করে শরীরে লাগতে না লাগতেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে আমাকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

অবসন্ন দেহটাকে শয্যায় এলিয়ে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবেই সেদিন-কার ডাক দেখছিলাম। রাওয়ালপিণ্ডির ছাপমারা একটি চিঠি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমার জনৈক শুভাকাঙ্খী জানিয়েছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে আমার উদ্দেশ্যে এক নিমন্ত্রণ লিপি এসেছে। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন দফতরে ঘোরাফেরা করছে এই নিমন্ত্রণ লিপি। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এই বার্তা হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে আনন্দের ঝঙ্কার তুললো। মুহূর্ত মধ্যে সকল অবসন্নতা কোথায় উধাও হয়ে গেল।

সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিষিদ্ধ দেশ অর্থাৎ Iron Curtain-এর দেশ বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর সাধারণ লোকদের জন্য এই দেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ প্রায় বলা চলে। ফলে, খুব কম সংখ্যক লোকের ভাগ্যেই সোভিয়েট ভ্রমণের সুযোগ ঘটে থাকে। কে জানতো যে আমার স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে সেই স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে। বিড়ালের ভাগ্যেও তাহলে শিকে ছিঁড়ে।

সরকারী নিয়মকানুনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে এই নিমন্ত্রণবার্তা যখন দূরের পথে পাড়ি জমানোর হাতছানি দিয়ে একদিন আমার দুয়ারে এসে আহ্বান জানালো আমার হাতে সময় তখন অতি অল্প।

জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের প্রধান অংশ পাক-পিপুলস্ গ্রুপের

সম্পাদিকা হিসাবে আমার কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে—বিশেষ করে জাতীয় পরিষদের শীতকালীন ঢাকা অধিবেশন যখন একেবারেই আসন্ন। আগামী ২৫শে নভেম্বর থেকে এই অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। এই আসন্ন অধিবেশনকে পশ্চাতে ফেলে এখন আমার এত দূরের পথে পাড়ি জমানো উচিত হবে কিনা সেই চিন্তাতেই কেটে গেল বেশ কটা দিন। নূতন দেশ দেখবার প্রবল আকাঙ্খার সঙ্গে সংঘাত বেধেছে কর্তব্যবুদ্ধির। দ্বিধা আর সঙ্কোচের সঙ্গে বোঝাপড়া চললো মনের।

এদিকে শুভাকাঙ্খীর দল শীতকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণটাকে বিশেষ উৎসাহজনক নয় বলেই মত প্রকাশ করলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের হাড়কাঁপানো শীত ইতিহাস খ্যাত। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাট নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যুদ্ধরত ফরাসী সৈন্যদল এই শীতের দাপটে পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও সমগ্র পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী জার্মান সৈন্যদল এই শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নের এমন ইতিহাস সৃষ্টিকারী শীতকে ভয় করবে না এমন লোক কল্পনা করাও যায় না।

আমি সোভিয়েট ভ্রমণের আনন্দে এতই মশ্‌গুল ছিলাম যে ঐ মারাত্মক শীতের কথাটা আমার মনে কোনরকম দাগ কাটবার অবকাশই পেলনা। ফলে অনেকেই আমাকে হয়তো একটা আহাম্মক বলে ধরে নিল। যে বাঘাশীতের ভয়ে পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীরাই সন্ত্রস্ত সেই শীতকে আমি মোটে গ্রাহ্যই করছিনা দেখে অনেকে অনুকম্পার হাসি হেসেছিলেন। আবার অনেকের মুখে এমন এক হাসির ভাব লক্ষ্য করেছি যার ভাবখানা হচ্ছে যে, 'যাওতো একবার তারপর বাছাধন মজাটা টের পাবে।' আর যারা সত্যিই শুভাকাঙ্খী তারা কিন্তু যাবার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং উৎসাহও দিয়েছিলেন প্রচুর।

সত্যিকথা বলতে শীতের কথা চিন্তা করে আমি মনে মনে আতঙ্কিত হয়েছিলাম যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু সেই ভাবটাকে বাইরে প্রকাশ হতে দেইনি। এমন সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চায়নি।

পূর্বেই বলেছি, অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে প্রস্তুত হতে হয়েছিল, তাই তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব কিছুটা শীতবস্ত্র তৈরী করে নিলাম।

আমার আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট বহু আগে থেকেই করা ছিল কিন্তু তাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নামোল্লেখ ছিলনা। লোক পরম্পরায় শুনতে পেলাম, 'ইউ. এস. এস. আর.' এই চারটি অক্ষর পাসপোর্টে বসানো নাকি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এর জন্য বহু কাঠ খড় পোড়ানোর পরও নাকি অনেককেই ব্যর্থ হতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে একটা Standing Committeeর মিটিংয়ে যোগদান করবার জন্য আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হোল। এই সুযোগে আমি একদিন দেখা করলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হাবীবুল্লাহখানের সঙ্গে। তাঁকে বললাম আমার পাসপোর্টে উক্ত চারটি অক্ষরের ছাপ মারার ব্যবস্থা করে দিতে। হাবীবুল্লাহসাহেব কোনরকম দ্বিধা না করে তক্ষুনি তাঁর নিজস্ব সেক্রেটারীকে ডেকে আমার পাসপোর্টে ইউ. এস. এস. আর. অক্ষর চারটি লিখিয়ে আনবার হুকুম দিলেন আর সেই সঙ্গে বেয়ারাকে হুকুম করলেন কফি পরিবেশন করতে। আইনমন্ত্রী জনাব খুরশীদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁরা উভয়েই জানালেন, আমার রাশিয়া যাওয়াতে সরকারী কোন বাধা নেই তবে আইনমত সরকারী অনুমোদন দিতে একটু সময় লাগে, কারণ নানা বিভাগ ঘুরে খবরাখবর নিয়ে অনুমোদন দিতে হয়। যাই হোক, তাঁরা দু'জনাই আমার রাশিয়া ভ্রমণের সাফল্য কামনা করে অভিনন্দন জানালেন।

নানারকম আলাপ আলোচনা চলছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর হাবীবুল্লাহসাহেবের সেক্রেটারী আমার পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। পাতা উল্টে দেখি সদ্যলেখা ইউ. এস. এস. আর.

Scanned with CamScanner

জলজ্বলে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাবীবুল্লাহ সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিন বিদায় নিলাম।

এবার আমার যাত্রার আয়োজন মোটামুটি তৈরী। বাড়ীতে ব্যক্তিগত কতকগুলো অসুবিধা ছিল। সেগুলো কোনরকম গোঁজা-মিল দিয়ে একরকম ব্যবস্থা করলাম। সব রকম ভাবে প্রস্তুত হয়ে এইবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সরকারী অনুমতি পত্রের।

করাচীতে অবস্থিত সোভিয়েট দূতাবাস থেকে আমাকে জানানো হোল, যদি আমি সাতই নভেম্বরের পূর্বে তাঁদের দেশে পৌছে উক্ত দিবসকে উপলক্ষ করে বিপ্লব-দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারি তাহলে খুবই ভাল হয়। আমি নিজেও খুব আগ্রহান্বিত ছিলাম ঐ অনুষ্ঠানটিতে যোগদান করবার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু চেষ্টা করেও কিছুতেই এগারো তারিখের আগে রওয়ানা হতে পারলাম না।

ঢাকা থেকে করাচী দিনে দু'বার করে বিমান যাতায়াত করে। আমার বিমানটা ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটায়। বিমান বন্দরে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রজপ্রতিম শেখ মুজিবর রহমান, পাবনা সমিতির সম্পাদক ওহাব মিয়া, উক্ত সমিতির সদস্য অনুজপ্রতিম মফিজ, পি. পি.-এর গোলাম রসূল, ইত্তেফাক পত্রিকার তাহের উদ্দীন ঠাকুর, এবং কয়েকজন এম. এল. এ. ও এম. পি. এ. আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

ছেলেমেয়েদের কথা স্মরণ করে মনটা দমে যাচ্ছিল। অসহায় দু'টী শিশুকে রেখে এতদূরের পথে পাড়ি জমাতে গিয়ে মনের দিক থেকে এখন আর কোন উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। মনের এই ভাবটাকে বাইরে প্রকাশ হতে দিলাম না—কারণ, মেয়েটা আমার বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল। আমাকে একটু বিষণ্ণ দেখলে ও কেঁদে ভাসাবে। এমনি-তেই আজ সারাদিন ওর চোখের কোণে অশ্রু টলমল করছে দেখতে পেয়েছি—একটু স্পর্শ পেলেই উপ্‌চে পড়বে বুঝতে পেরেছি।

ক্রমে সময় এগিয়ে এলো। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানের বিরাট গহ্বরে প্রবেশ করলাম। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত অবস্থা দাঁড়াল আমাদের। সচল যন্ত্রের ভীষণ ধ্বনির ভিতর দিয়ে বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জানালার কাঁচের আড়াল থেকে লোকজনের বিদায় অভিনন্দনের হাত নাড়া দেখছি। এতক্ষণে বিমানটা চলতে শুরু করেছে—ছেলেমেয়ের মুখ ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। কিছু দূরে গিয়ে বিমানটা দাঁড়াল। তারপর হার্ডল রেসে যোগ দেবার মত ট্যাক্‌সিং করে ভয়ানক শব্দে ছুটে গেল খানিকটা। পরে একসময় আকাশে ডানা মেলে উড়ে চললো, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ঢাকা নগরী আর তার আলোকসজ্জার আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর সৃষ্টি এই জেট্ বিমানগুলি। আশ্চর্য্য আর অভূতপূর্ব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই ৭০৭ বিমানগুলি তার বিরাট গহ্বরে যাত্রীদের বহন করে নিয়ে চলেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। এর গতি এবং প্রকৃতি দুই-ই অদ্ভুত। বিশাল-কায় এ বিমানগুলির উদরে এত স্থান আর ডানায় এত ক্ষিপ্রতা যে ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—অদ্ভুত এদের গঠন প্রকৃতি।

কবে কোন্ এক মহাক্ষণে আকাশের পাখী দেখে মানুষের মনে আকাঙ্খা জেগেছিল অমনি অবলীলাক্রমে আকাশে গা এলিয়ে ভেসে বেড়ানোর, আর সেই আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রচেষ্টায় লেগে গেল বুদ্ধিমান মানুষ। অবশেষে মানুষের বুদ্ধির নিকটে প্রকৃতিকে হার মানতে হোল—মানুষের সৃষ্টির নিকটে মাথা নোয়াতে হোল প্রকৃতিকে। মায়ের কোলে শিশু যখন চাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে করায়ত্ত করবার জন্য হাত বাড়ায়, শিশুর সেই মধুর অজ্ঞতায় আমরা মনে মনে হেসে থাকি। আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে চাঁদ হয়তো আর মানুষের নাগালের বাইরে থাকবে না। এ যুগের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সে দূরকে করেছে

নিকট—আকাশ আর মাটিতে কোন ব্যবধান সৃষ্টি হতে দেয়নি—তাই আকাশের সঙ্গে মাটীর কোলাকুলি হচ্ছে অহরহ।

পূর্বেই করাচীতে খবর পাঠিয়েছিলাম, তবুও মনে মনে দুশ্চিন্তা জাগছিল যদি কেউ না আসে করাচী বিমানবন্দরে তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে আমার। রাত দশটায় করাচীতে বিমান অবতরণ করলো। জানালা দিয়ে দেখছি মাত্র আলোর সমারোহ। পাহাড়ের গা বেয়ে এই বিমানবন্দরের আলোক-সজ্জা বহুদূর থেকেই যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁদের মুগ্ধকরে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসতেই সোভিয়েট দূতাবাসের লোক সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে করমর্দন করলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি আত্মীয়বন্ধুদের সবাই উপস্থিত। যাঁদের খবর পাঠানো হয়েছিল তাঁরা সবাই এসেছেন দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম কিন্তু সে স্বস্তি আমার বেশীক্ষণ স্থায়ী হোল না। সবাই এসেছেন আমাকে নিতে, এখন কার বাড়ীতে উঠি আর কাকে অসন্তুষ্ট করি এইটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত অগ্রজ প্রতিম আলীম সাহেবের সঙ্গে যেতে হোল—তিনি একরকম জোর করেই তাঁর গাড়ীতে আমাকে তুললেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে মনে কাজের তালিকা তৈরী করছি এমন সময় সোভিয়েট দূতাবাস থেকে টেলিফোন এলো, সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আলীম ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দশটার সময় উপস্থিত হলাম দূতাবাসে। খবর পেয়ে রাষ্ট্রদূত হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন পাশের ঘরথেকে। ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। রাষ্ট্রদূতের নির্দেশে কফি ও কিছু খাবার পরিবেশন করে গেল 'ওয়ালডা' নামে একটি মেয়ে—ভারী মিষ্টিমুখ মেয়েটির। কফি খেতে খেতে আরও প্রয়োজনীয় দু'চারটে কথা বলে বিদায় নিলাম দূতাবাস থেকে।

এইবার শুরু হোল দৌড়াদৌড়ি। পুরো দুটো দিন প্রায় ঘোড় দৌড়ের মধ্যে কাটলো—বুঝতেই পারলাম না কোথা দিয়ে সময় কেটে

গেল। এই দুটোদিন পি. আই. এর অফিস, ষ্টেটব্যাঙ্ক ও স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট যোগাড়ের প্রচেষ্টায় কাটলো। কিছু বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এক মাত্র ষ্টেট ব্যাঙ্কেই যে কতবার যেতে হয়েছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। মনে মনে ঠিক করেছি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার পথে একটু ইউরোপটা ঘুরে আসবো—কিন্তু কে জানতো যে বিদেশে যাবার এত ঝামেলা। বলাবাহুল্য আলীম ভাইএর সাহায্য না পেলে আমার একার পক্ষে মাত্র দু'দিনে এত কাজ সম্পূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

পরের দিন রবিবার সুতরাং অফিস সংক্রান্ত কোন কাজ করা সম্ভব হোল না। আমার পক্ষে হোল বাধ্যতামূলক বিশ্রাম। কিন্তু তবু বিশ্রামের সময় কোথায়? দু'একজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত ও কেনাকাটার কাজ শেষ করে রাখলাম। রাত্রে সোভিয়েট দূতাবাসে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হোল—কারণ আমাকে উপলক্ষ করেই এই নিমন্ত্রণ সভার আয়োজন। খাবার টেবিলে ও-দেশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও সবচেয়ে প্রিয় খাবার ক্যাভিয়ার পরিবেশন করা হোল। ক্যাভিয়ার হচ্ছে এক জাতীয় মাছের ডিম। গোটা ইউরোপে ক্যাভিয়ারের খুব কদর, একে অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমি ক্যাভিয়ারের দুর্গন্ধকে একেবারেই পছন্দ করতে পারলাম না। এই ক্যাভিয়ারের কত প্রশংসাই না শুনেছি আর আজ হাতের কাছে পেয়েও তা মুখে তুলতেই পারছি না। আমি ছাড়া আর সবাই অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলেন। আমার তৃপ্তি তাদের সাগ্রহ খাওয়া দেখেই।

নানারকম গল্পের মধ্যে খাওয়ার পর্ব সমাধা হোল। এরই মধ্যে এ্যাম্বাসেডার সাহেব দু'একটি রুশ শব্দ সম্পর্কে আমাকে প্রথম পাঠ দিলেন। 'পাসিবো' মানে 'ধন্যবাদ'—দোব্রাওতরা' মানে সুপ্রভাত। অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণের পর আমার জ্ঞান ভাণ্ডারে আরও কয়েকটি রুশ শব্দের সংযোজন ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

পনেরো তারিখে বেলা তিনটায় আমার প্লেন ছাড়বে করাচী থেকে দিল্লী অভিমুখে। আমাকে বেলা দু'টো অবধি ছুটোছুটি করে বেড়াতে হোল। তবুও মনে হোল অনেক কাজই ঠিক পছন্দ মত করতে পারলাম না।

গোটা ইউরোপটাই ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা আছে আমার। একবার যখন ঘরের বার হয়েছি তখন চোখমেলে পৃথিবীটাকে দেখে নিতে চাই। নজরুলের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে।"

জগৎটাকে ভালকরে দেখতে হলে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ঠিক সেই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সরকারের তোষাখানা থেকে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ঐ কটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রার বেশী দিতে সরকার নারাজ। বহু পরিশ্রমের পর সেই মুদ্রার ব্যবস্থা হোল। এইবার হাঁফ ছেড়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। ঘড়ির কাঁটা যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে দেড়টার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে! সর্বনাশ, আমার বিমান ছাড়বে তিনটা পঞ্চান্নতে। এখন বাসায় ফিরে গিয়ে তারপর বিমান বন্দরে পৌঁছাতে কমপক্ষে দেড়ঘণ্টা সময়ের দরকার। উঠি-কি-পড়ি-মরি করে ছুটলাম বাসার দিকে।

ভাগ্য ভাল, জিনিসপত্র মোটামুটি আগে থেকেই গোছানো ছিল। দু'একটা জিনিস যা কেনাকাটার বাকি ছিল তার একটা ফর্দ্দকরে প্রথম দিনই অনুজপ্রতিম বশিরউদ্দীনকে দিয়েছিলাম—সেইগুলো কোন রকমে ব্যাগে ভরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম বিমান বন্দরের দিকে।

বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি রুশ রাষ্ট্রদূতের পত্নী এবং তাঁদের দূতাবাসের বিভিন্ন কর্মচারী সস্ত্রীক আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য সেখানে উপস্থিত আছেন। রুশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিরাট একটা ফুলের তোড়া গুঁজে দিলেন হাতে—তারপর চললো করমর্দন ও মালা পরানোর ধূম। ক্রমে বিদায় লগ্ন

ঘনিয়ে এলো। মাইকে বিমানে আরোহণের অনুরোধ ঘোষিত হোল। জনাব মেরাজ হোসেন, বশিরউদ্দীন, সেলিম প্রভৃতি বন্ধুরাও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় দিলেন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিমানে আরোহণ করলাম। ঠিক তিনটা পঞ্চান্ন মিনিটে আমাদের বিমানটি করাচী বন্দর ত্যাগ করে দিল্লীর পথে পাড়ি জমালো। মনটা আমার হর্ষে বিষাদে পূর্ণ হয়ে রইলো। বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি। কাজেই এক নূতন অনুভূতি জাগছে মনে। অপরদিকে আমার অসহায় সন্তান দুটীর বিষাদক্লিষ্ট চেহারা স্পষ্টভাবে মানসপটে ভেসে উঠছিল, তাই মনটা বিষাদে পূর্ণ হয়েছিল ওদের কথা ভেবে।

বিমান উড়ে চললো আকাশ পথে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম—ধীরে ধীরে করাচী মিলিয়ে যেতে লাগলো। দেশ ত্যাগকরে যাবার আগে দেশের চেহারা আর একবার ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। অবশ্য আমি যে দেশের বাসিন্দা সে দেশের সঙ্গে এই করাচীর কোন মিল নেই। এ দেশের চেহারা বড় রুক্ষ, বড় কাঠখোট্টা; আর আমার বাঙ্গলা সবুজে শ্যামলিমায় দীপ্ত। ক্রমেই দূরে বহুদূরে সরে যাচ্ছি আর পিছনে ফেলে যাচ্ছি আমার প্রিয় দেশ পাকিস্তানকে।

দিল্লী পৌছলাম সন্ধ্যায়। আকাশ পথে করাচী থেকে দিল্লীর দূরত্ব মাত্র একঘণ্টার, কিন্তু তাতেই মনে হচ্ছিল যেন রাত্রি তার ঘন আঁচল পেতে দিয়েছে সমগ্র পৃথিবীর উপর। বিমান থেকে নামতেই পাকিস্তান দূতাবাসের দু'জনা কর্ম্মচারী এগিয়ে এসে জানালেন সাদর আহ্বান—এ ছাড়া রুশ দূতাবাসের মিঃ ভরোসভও উপস্থিত ছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আমার সঙ্গে আরও একজন পাকিস্তানী মহিলাযাত্রী ছিলেন। ইনিও পূর্বপাকিস্তানের রাজসাহীর অধিবাসী—পেশা ডাক্তারী। শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করবার উদ্দেশ্যে ইনি বিশেষ বৃত্তি নিয়ে যাচ্ছেন তাসখন্দে। দু'বছর লাগবে তাঁর এই পারদর্শিতা অর্জন করতে।

শুনলাম রাত্রিটা দিল্লীতেই কাটাতে হবে। আমার পরবর্তী প্লেন আগামী কাল সকাল দশটায়। আমার সঙ্গে ভারতের কোন ভিসা ছিলনা। তার কারণ, আমাদের পররাষ্ট্র দফতর থেকে বলা হয়েছিল যে ভারতে ২৪ ঘণ্টার কম সময় অবস্থান করলে কোন অন্তবর্তী (Tranrsit) ভিসার প্রয়োজন হয়না। অথচ কার্যতঃ দেখা গেল, দিল্লী বিমান বন্দরের পুলিশ পুংগবরা সেকথা মেনে নিতে রাজী নয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে যেহেতু রাত্রিবাসটা ভারতের মাটীতে হচ্ছে সেহেতু ট্রানজিট্ ভিসা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

পাকিস্তান দূতাবাসের কর্মচারীরা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্টের সদস্যা আমি—সুতরাং আমি ভি. আই. পি. দলভুক্ত। আমাকে নিয়ে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াটাই তাঁদের জন্য বিড়ম্বনাময়। অবশেষে বহুচেষ্টা করে আমাকে সহরে রাত্রিবাসের অনুমতি দেওয়া গেল। কিন্তু এরমধ্যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেল প্রায় দু'ঘণ্টা। ছোটবেলায় গল্প শুনেছিলাম, এক গাধা জন্ম থেকেই এঁদো পুকুরের পানি খায়। কারণ, তার বাসস্থান ছিল ঐ এঁদো পুকুরের কাছে। গাধাটা বড় হবার পর তাকে এক সম্পন্ন গৃহস্থ কিনে নিলেন। এই গৃহস্থের বাড়ীর পাশেই ছিল একটি নদী। এখন গাধার হোল মুস্কিল—তার চিরকাল নোংরা পানি খেয়ে অভ্যাস, এখন নদীর স্বচ্ছ পানি সে কিছুতেই খেতে পারে না। অবশেষে সে পা দিয়ে পানিটা ঘোলা করে নিয়ে তবেই খেতে লাগলো। দিল্লীর কর্তাদের কাণ্ড দেখে ছেলে বেলায় শোনা সে গল্পটাই আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেলো।

দিল্লী থেকে পরবর্তী পথটুকু ভ্রমণ করতে হবে 'এয়ার ইণ্ডিয়ার' বিমানে। কাজেই এখন থেকে আমরা 'এয়ার ইণ্ডিয়ার' অতিথি হিসাবে গণ্য হলাম। বিমানবন্দরের পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পাবার পর আমাদের এয়ার ইণ্ডিয়ার বাসে করে সহরের এক হোটেলে এনে তোলা হোল। হোটেলের চেহারা দেখে আমি

স্তম্ভিত হলাম। এবার সত্যি সত্যিই বিরক্ত হলাম। হাজার হলেও একটা ভব্যতা জ্ঞান থাকা উচিত। আমি বিমানে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছি—তা ছাড়া আমার একটা বিশেষ পরিচয় রয়েছে—এমতাবস্থায় আমাকে এইরকম একটা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে এনে তোলা হোল। এতে যে তাদেরই মানসিক দৈন্যতার রূপটা প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

পাকিস্তান দূতাবাসের নিরুপায় কর্মচারী দু'জন মুখ কাঁচু মাচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন—কারণ তাদের করণীয় কিছু নেই। রাত্রিটা এই তৃতীয় শ্রেণীর স্থানে কাটাতে হবে ভাবতেও খারাপ লাগছে—কিন্তু দ্বিতীয় আর কোন উপায়ও তো নেই। তবুও ভাগ্যিস আমাদের দু'জনাকে একই ঘরে ঠেলে দেয়নি। এতটুকুন ভদ্রতা কি করে এদের মনে দেখা দিল সেইটা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেয়ারা এসে রাত্রের খাবার দিয়ে গেল। যেমন হোটেলের চেহারা তেমনি তার খাবারের চেহারা। কাজেই সেটা মুখে তুলতে প্রবৃত্তি হোল না। মুখহাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক রাত্রি অবধি জেগে থাকতে হোল। এ ধরণের নোংরা হোটেলে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। চারদিকে নোংরা পর্দা ঝুলছে। দেখে মনে হচ্ছে হোটেলের জন্মের পর এই পর্দাগুলো ধোপার বাড়ীর চেহারা দেখেনি। মনে হচ্ছে যেন বাতাসে ধূলোর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার কীট্ নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করছে।

কোনরকমে সেই দুঃসহ রাত্রিটা কাট্‌লো। ভোরে চোখ খুলতেই ভাবলাম গোছলের কাজটা সেরে রাখি। যাচ্ছি শীতের দেশে, চোখে-তো কখনও দেখিনি—বইয়ে পড়েছি সে নাকি সাংঘাতিক শীতের দেশ। সুতরাং পরবর্তী গোছলটা যে কবে কোথায় করতে পারবো তার তো কিছু ঠিক নেই। অথচ আমরা বাঙালীরা 'তেলেজলে' মানুষ, শরীরে পানি না ছোঁয়ালে স্বস্তি মেলেনা। তাছাড়া রাত্রেই শুনেছি যে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমাদের পরবর্তী বিমানযাত্রা সুরু হবে সকাল সাড়ে দশটায়, সুতরাং হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ধীরে সুস্থে সাড়ে ন'টায় বেরুলেও চলবে।

গোছল সেরে বেশবাস পরিবর্তন করে মনটা স্বভাবতঃই প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো—এইবার এক কাপ ধূমায়িত চায়ের আশায় তীর্থের কাকের মত মানসিক অবস্থা দাঁড়িয়েছে। চায়ের জন্য মনে মনে ধ্যান শুরু করেছি, হঠাৎ টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং শব্দে আমার ধ্যানভঙ্গ হোল। রিসিভার হাতে তুলতেই ভারতীয় বিমান কোম্পানীর লোক জানালেন, এক্ষুনি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে, সুতরাং আমি যেন কাল বিলম্ব না করে তাদের অফিসে উপস্থিত হই। খবরটা শুনেই মনটা খিচড়ে গেল। এ কেমন দেশে এসেছিরে বাবা—সকাল বেলা নাস্তা করা দূরে থাক এক কাপ চাও কপালে জুটলো না। মনে মনে হোটেলওয়ালার চৌদ্দ পুরুষকে গালাগাল দিতে দিতে ছুটলাম বাসের উদ্দেশ্যে।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর আবার সে সকল নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে তরী পার হতে প্রায় একঘন্টা কেটে গেল। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম। বিমানে আরোহণ করবার ঘোষণা শুনবার অপেক্ষায় আছি। হঠাৎ রুশ দূতাবাসের মিঃ ভরোসভ্‌ সঙ্গে একটি যুবককে নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। পরিচয় হোল—তাঁর নাম আইজ্যাক গ্রোবভ্‌। আলাপে আলাপে জানা গেল যে ইনিও এককালে "সেভিয়েট ওম্যান" পত্রিকায় কাজ করতেন কিন্তু বর্তমানে রুশ দেশ থেকে যে সকল ভূতত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ পাকিস্তানে কাজ করছেন ইনি তাঁদের অন্যতম।

মিঃ ভরোসভ্‌ এবং আইজ্যাক গ্রোবভ্‌—এরা দু'জনাই ছুটী ভোগ করতে দেশে অর্থাৎ মস্কোতে ফিরে যাচ্ছেন। আইজ্যাকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র আছে। ছেলেটি কিন্তু ভয়ানক ছট্‌ফটে অথচ খুব মিষ্টি—বয়স ৮।৯ হবে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আলাপ করতে পারলামনা

কারণ ওরা অর্থাৎ মা ও ছেলে কেউ ইংরেজী, উর্দু বা বাংলা কোনটাই বলতে পারেন না একমাত্র নিজেদের ভাষা ছাড়া।

একটু পরেই মাইকে ঘোষণা করা হোল বিমানে আরোহণ করবার জন্য। নিরাপত্তা বন্ধনী এঁটে আকাশে উড়বার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছি এমন সময় বিমানের একজন কর্মচারী মুখখানা কাঁচুমাচু করে জানালেন যে যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ বিমান ছাড়তে দেরী হবে সুতরাং আমরা যেন নেমে গিয়ে বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করি। মনটা দারুণ বিরক্তিতে ভরে গেল। হায়রে ভারত—যেমন তোমার আতিথ্যের নমুনা, তেমনি তোমার বিমান সার্ভিস!

বিমানের গোলযোগকে ঠিক করতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লাগলো। ইতিমধ্যে একান্ত বাধ্য হয়ে যাত্রীদের চা ও স্যাণ্ডউইচ পরিবেশন করা হোল। এতক্ষণ পরে চা পেয়ে মনটা তৃপ্ত হোল—আজ যেন চায়ে অমৃতের স্বাদ পেলাম। এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে জীবনে আর কখনও চা খেয়েছি বলে মনে পড়েনা। কিন্তু সময় তো কাটেনা—কতক্ষণ আর বসে বসে কাটানো যায়। আইজ্যাকের সঙ্গে গল্প গুজবে অবশ্য কিছুটা সময় কাটলো। ভদ্রলোক চমৎকার উর্দু বলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্নস্থানে কার্যোপলক্ষে যে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে তাই পাকিস্তান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান তাঁর আছে।

এখানেই দু'জনা মার্কিণ যাত্রীর সঙ্গেও আলাপ হোল। তাঁরা সস্ত্রীক যাচ্ছেন রুশদেশ ভ্রমণে—অবশ্য নিজ খরচায়। আমি একখানা সাদা লেসের শাড়ী পরেছিলাম। এরা উভয়েই আমার সেই শাড়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। অথচ আমি জানি আমার শাড়ীটা এমন কিছু 'আহামরি' গোছের ছিলনা—সাধারণ লেসের সাদা শাড়ী। এই দেখেই এরা পাগল, মনে মনে ভাবলাম, আমাদের ঢাকাই জামদানী বা জড়িপার টাঙ্গাইল দেখলে বেচারারা না-জানি কি করবে?

দু'ঘণ্টা পর অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বারোটা তখন—আমাদের আবার

Scanned with CamScanner

বিমানে আরোহণ করতে আহ্বান জানানো হোল। নাঃ, এবার আর কোন গোলমাল নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি হুস্ করে আকাশে উঠে গেল—যাত্রা শুরু হোল আকাশপথে।

দিল্লী থেকে মস্কোর দূরত্ব হচ্ছে ৩,২৫০ মাইল। এই বিমানটি একেবারে মস্কো গিয়ে থামবে, পথে কোথাও থামবার ব্যবস্থা নেই। এই সুদীর্ঘ ৩,২৫০ মাইল অতিক্রম করে মস্কো পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ছ'ঘণ্টা অর্থাৎ রাত্রিবেলা আমরা মস্কো পৌঁছাবো। বিমানটি ক্রমেই উপরে উঠতে লাগলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মেঘ আর মেঘ। উপরে এত মেঘের রাজত্ব যে সেটা নিচের পৃথিবীর মানুষ কল্পনাই করতে পারেনা—নিচে থেকে আমরা আর কতটুকু দেখতে পাই।

ক্রমে আরও, আরও উঁচুতে উঠে গেল বিমানটি। সমস্ত মেঘের স্তর ভেদ করে বিমানটি উন্মুক্ত নীলাকাশে ডানা মেলে উড়ে চললো। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি পুঞ্জীভূত মেঘের বিশাল সমুদ্র। মনে মনে স্বীকার করতে হোল, আজকের পৃথিবীর মানুষ আমরা নানা দিক থেকেই অত্যন্ত ভাগ্যবান।

উড়ে চলেছি নীলাকাশের গায়। ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে পড়েছি আর কল্পনায় ছবি এঁকেছি কেমন করে পরীরা আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় আর কেমন করে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজকুমার উড়ে বেড়ায় রাজ্য রাজ্যান্তরে। সেই কল্পনার রাজকুমার আর রূপকথার পরীদের মত করে একদিন নিজেও আকাশের গায় ভেসে বেড়াতে পারবো সেই সময় এই চিন্তা কল্পনাকেও আশ্রয় করতে পারেনি। অথচ আজকের জগতের শিশুদের নিকটে এটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যতই দিন গড়িয়ে যাচ্ছে ততই বিজ্ঞানের গুণে পৃথিবীর মানুষ নানারকম অসাধ্য সাধন করে নব নব আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আপন অস্তিত্বের প্রতিই সন্দিহান হয়ে পড়লাম। বিশাল প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টির মাঝে নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হতে লাগলো।

দিল্লী শহরের চারপাশে শুধুই পাহাড় আর পাহাড়। প্রায় আধঘণ্টা ক্রমাগত উড়ে যাবার পর আমাদের বিমানটি পৌঁছাল হিন্দুকুশ পর্বতমালার উপর। জানালা দিয়ে তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। চোখ ফেরাতে মন চাইছে না, দু'চোখ ভরে দেখছি হিন্দুকুশ পর্বতরাজি। মনটা বার বার ফিরে যাচ্ছে অতীতের ইতিহাসের পাতায়।

প্রায় আধমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই পর্বতমালা। বরফে আচ্ছাদিত হয়ে বহুদূর ব্যাপী নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আপন অস্তিত্বের কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করছে সৃষ্টির অপার মহিমার কথা। ধীরে ধীরে পর্বতরাজি মিলিয়ে গেল। এবার মেঘ আর মেঘ। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই মেঘের রাজ্য, যেন মেঘের রাজ্যে মিতালী করতে চলেছি আমরা। অপূর্ব সৌন্দর্য্যময় সে রাজ্য।

পুরো ঘণ্টা দুই একই ভাবে বিমানটি উড়ে চললো মেঘের উপর দিয়ে। মাঝে মাঝে সূর্যকে মেঘের আড়ালে মুখ লুকাতে দেখা গেল। এ যেন সখীদের কৌতুকে নবোঢ়া লজ্জিত হয়ে শাড়ীর আঁচলে রাঙ্গা মুখ লুকাচ্ছে।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এই ফাঁকে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। তাদের নিশ্চিন্ত নিদ্রার চেহারা দেখে আমারও খুব ইচ্ছা হতে লাগলো একটু ঘুমানোর জন্য। কিন্তু তা কি আর হবার উপায় আছে—নিদ্রাদেবীর সঙ্গে কবে থেকে যে আমার শত্রুতার সূত্রপাত হয়েছে আজ সেটা মনে করতে পারছিনা—তিনি চিরকাল আমার প্রতি রুষ্টা, তাই দিবানিদ্রার সুখাস্বাদ কোনদিন উপলব্ধি করতে পারলাম না। এরপর বিমানে নিদ্রা, সেতো কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। দু'একবার বৃথা চেষ্টা করেও যখন নিদ্রাদেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে অক্ষম হলাম, বাধ্য হয়েই এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও অপার মহিমা দেখায় আত্মনিয়োগ করলাম।

এইভাবে সময় যে কখন কোন ফাঁকে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে

সেটা উপলব্ধি করবার আগেই সজোরে মাইকে ঘোষিত হোল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানটি মস্কোর 'শ্রীমিতিভো' বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। আমি তো ভেবেই পেলামনা এই মেঘের সমুদ্র ভেদকরে কি করে আবার পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করবে আমাদের বিমানটি? যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই মেঘ আর মেঘ। এরমধ্যে বিমানচালক কি করে বুঝতে পারলেন যে আমরা মস্কো পৌছে গিয়েছি—আশ্চর্য।

ধীরে ধীরে বিমানটি মেঘের স্তর ভেদ করে নিচে নামতে লাগলো। লাল আলো জ্বালিয়ে যাত্রীদেরকে নিরাপত্তা বন্ধনী বাঁধবার অনুরোধ জানানো হোল। মিনিট সাতেক পরেই ধরণীর মাটী স্পর্শ করলো মানুষের তৈরী যান্ত্রিক পুষ্পরথটি। শ্রীমিতিভো বিমানবন্দর তখন সন্ধ্যার আঁধারে ম্লান।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, একটু আধটু বরফের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। বিমানের পরিচারিকা সকলের পাসপোর্ট নিয়ে তৈরী করতে বললেন। একটু পরেই রুশ দেশের পুলিশ বিমানে প্রবেশ করে সকল যাত্রীর কাছ থেকে তাঁদের পাসপোর্ট নিয়ে চলে গেল। এ অভিজ্ঞতা নূতন। ইতিপূর্বে যত দেশ ভ্রমণ করেছি বিমান বন্দরে নেমে গিয়ে পাসপোর্ট জমা দিতে হয়েছে—কাজেই এদের ভিন্ন রীতিতে একটু আশ্চর্য্য হলাম। এইবার নামবার অনুমতি পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হোল—এ আবার কি কাণ্ড! একজন লোক ক্যামেরা ধরে পটপট করে সব যাত্রীদের ছবি তুলে নিচ্ছে। পরে বুঝেছিলাম, এ লোকটা মস্কো পুলিশের লোক—আর এই তাদের নিয়ম।

বিমানের সিঁড়ির গোড়াতেই একটি বাস দাঁড়িয়েছিল। সকল যাত্রীকে সেই বাসে তোলা হোল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বাসে উঠবার ক্ষণিক সময়টুকুর মধ্যেই মস্কোর হাড়কাঁপানো শীতের আভাস পেলাম। বাসটা মিনিট তিনেকের মধ্যেই পৌছালো এয়ারপোর্ট টারমিনাসে।

'সোভিয়েট উইম্যান' পত্রিকার কার্যালয়ে আয়োজিত ভোজসভায়

সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক অফিসে গণ্যমান্য কতিপয় মহিলার সঙ্গে

Scanned with CamScanner

লম্বা ঘর, তার এক পাশে বসবার জন্য গদীআঁটা চেয়ার পাতা। মাঝখানে মস্কোর পুলিশ অর্থাৎ বিমান বন্দরের জন্য যাঁরা কাজ করেন। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে বসবার ব্যবস্থায় যখন রত এমন সময় একজন প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন পরিষ্কার হিন্দীতে। তাঁর হিন্দী শুনে বিস্মিত হলাম কিন্তু সে ভাবটা চেপে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেই তিনি আমার হাতে একটা ফুলের তোড়া গুঁজে দিয়ে করমর্দ্দন করে জানালেন যে তিনি এসেছেন 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার পক্ষ থেকে আমাকে স্বাগতম জানাতে। পরে জেনেছিলাম, ভদ্রমহিলার নাম মারিয়া প্রিজুনোভা। ইনি "সোভিয়েট ওম্যান" পত্রিকার হিন্দী সংস্করণের সম্পাদিকা। মারিয়ার সঙ্গে আরও একজন মহিলা এসেছেন। ইনি সোভিয়েট মহিলা সংস্থার ডেপুটি চীফ্। নাম নীনা ভরোনীনা—এদের সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন কিন্তু তাঁদের নাম জানা হয়নি।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান দূতাবাসের পক্ষ থেকে মিঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ এসে আদাব জানালেন।

এখানেও বিমান বন্দরের নিয়ম কানুনের স্তর পাড় হতে ঘন্টাখানেক সময় শেষ হয়ে গেল। সুখের কথা এই যে আমাকে কিছুই করতে হোল না। আমাকে বসিয়ে রেখে মারিয়া ও জিয়াউদ্দীন সাহেব, এরাই সব করলেন। আমি নীনার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম। নীনা অবশ্য ইংরেজীতে কথা বলছিল। প্রায় এক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর ছাড়া পাওয়া গেল।

গাড়ীতে বসে আমার কোট এবং জুতোর দিকে লক্ষ্য করে নীনা বললো, আমার কোট বা জুতো কোনটাই নাকি এদেশের শীতের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ওদের দু'জনাকেই বেশ একটু চিন্তিত মনে হোল। কথায় কথায় জানালো, এবার শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবারকার শীত অত্যন্ত মৃদু। আমি মনে মনে বুঝতে চেষ্টা করলাম, এ শীতই যদি কম তাহলে তার আসল রূপটা কেমন?

Scanned with CamScanner

কারণ, বন্ধ গাড়ীতে বসেও আমার হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি ধরেছে—তাও আবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী। মারিয়া ওরই ফাঁকে জানালো, এখানকার শীত খুবই বিপজ্জনক, অল্পতেই বুকে ঠাণ্ডা লেগে যায়—তাই সর্বদাই খুব সাবধানে থাকতে হয়। একটু অসাবধান হলেই আর রক্ষা নেই—শীত মহারাজের মরণ কামড় খেতে হয়।

সকলের সঙ্গে পৌঁছালাম শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'হোটেল বার্লিনে'। হোটেলের ঘোরানো দরজা ঠেলে ওদের সঙ্গে লাউঞ্জে প্রবেশ করা মাত্রই সেখানকার সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে তাকাতে লাগলো আমার দিকে। সকলেরই বিস্মিত দৃষ্টি পতিত হতে লাগলো আমার উপর—আমার শাড়ীটাই যে তাদের দ্রষ্টব্য বস্তু সেটা বুঝতে পেরে মনে মনে কৌতুক অনুভব করছিলাম।

এখানেও নুতন নিয়ম দেখলাম, পাসপোর্ট জমা দিতে হবে। মারিয়া আমার কাছ থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে জমা দিয়ে এলো হোটেলে অবস্থিত সোভিয়েট বুরোর দফ্‌তরে। একটু পরে একটা বড় চাবী হাতে সে ফিরে এলো। আমার কামরা তিনতলায়, ২২৪নং কামরা আমার জন্য নির্ধারিত আছে। নীনা এবার বিদায় নিল। মিঃ জিয়াউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে উপরে এলেন আমার কামরা পর্যবেক্ষণ করতে। আমার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেটাই তার দ্রষ্টব্য।

খাবার খেতে যেতে হবে নিচের তলায় খাবারঘরে। মারিয়া আমাকে মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নিতে বললো। জিয়াউদ্দীন সাহেব ও মারিয়া দু'জনা আমাকে তৈরী হবার জন্য বলে নিচে নেমে গেলেন। এতক্ষণে চারদিক তাকিয়ে দেখবার একটু অবকাশ পেলাম। দু'টো ঘর, একটা বসবার এবং আর একটা শোবার। বসবার ঘরের দেয়ালের চারদিকে সুন্দর লতাপাতা আঁকা। আমাদের দেশের সঙ্গে এর বহুলাংশে মিল আছে। কিন্তু হাতে বেশী সময় নেই। তাই ভাবলাম এগুলো পরে ভালকরে দেখা যাবে, আপাতত ওরা অপেক্ষা করছেন নিচে।

আমি তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনে দরজা খুলে দাঁড়ালাম। মারিয়া হাসিমুখে জানালো যে, এইমাত্র 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার প্রধানা সম্পাদিকা টেলিফোন করেছিলেন। তিনি এখনি আসছেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

মারিয়ার সঙ্গে খাবারঘরে ঢুকতেই আবার সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হোল। সবারই দৃষ্টি আমার দিকে। যেমন একদিকে অস্বস্তি বোধ করছিলাম তেমনি আবার কৌতুকও বোধ করছিলাম। আমরা এক কোণে গিয়ে একটা টেবিল দখল করে বসলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রধানা সম্পাদিকা মারিয়া আফ্-সানিকেভার। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে পৌছালেন, সঙ্গে তাঁর আর একজন মহিলা। আলাপ করে জানতে পারলাম, ইনি উক্ত পত্রিকার প্রধানা সহ-সম্পাদিকা, নাম মার্তা ইনচুক। প্রধানা সম্পাদিকা বা তাঁর সহ-সম্পাদিকা এঁরা দুজনার কেউই ইংরেজী বা হিন্দী জানেন না—তাই মারিয়া গ্রিজুনোভা আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতে লাগলো। জিয়াউদ্দীন সাহেব অনেকদিন আছেন রুশ দেশে, তাই তিনিও রুশভাষা কিছুটা বলতে ও বুঝতে পারেন।

নানারকম গল্প গুজবের মধ্যদিয়ে আমাদের খাওয়ার পর্ব সমাধা হোল। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম, এদেশের লোকেরা সাদা পানি খায় না। সবাই হাল্কা ধরণের মদ্যপান করে অথবা সোডা ওয়াটার অর্থাৎ Mineral water পান করে। আমার পক্ষে এর দুটোই অসুবিধাজনক। মদ্যপানের তো প্রশ্নই আসেনা আর সোডা আমি একেবারেই পছন্দ করি না সুতরাং আমার জন্য 'ফ্রুক্তো' অর্থাৎ ফলের রসের ব্যবস্থা করা হোল।

প্রধানা সম্পাদিকা আমার গরম কাপড়ের স্বল্পতার পরিচয় পেয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অথচ আমার ধারণা ছিল যে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গরম কাপড় সঙ্গে নিয়েছি। তবু এদের বেশ খানিকটা চিন্তিত দেখে আমি মনে মনে লজ্জা পেলাম।

খাবার পর্ব শেষ হতেই প্রধানা সম্পাদিকা, তাঁর সহকারী সম্পাদিকা এবং জিয়াউদ্দীন সাহেব একে একে যথারীতি বিদায় নিলেন শুভরাত্রি জানিয়ে।

মারিয়া আমাকে আমার ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে জানিয়ে গেলো, কাল সকালে এগারোটায় 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার অফিসে যেতে হবে এবং সেখানে বসে আমার রুশ দেশের সফর তালিকা প্রস্তুত হবে। মারিয়া সাড়ে দশটায় আমাকে নিতে আসবে বলে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো।

পরের দিন যখন অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গলো তখনও আকাশ পরিস্কার হয়নি অথচ রাস্তায় যানবাহন চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা—আচ্ছা কাণ্ড! আমাদের দেশে সাতটা বাজার অর্থ হচ্ছে ঘর ভর্তি রোদ—আর এখানে এখনও মনে হচ্ছে দুপুর রাত। বিছানা ছেড়ে জানালায় এসে দাঁড়ালাম। এই অন্ধকারের ভেতরেই রাস্তায় কর্মব্যস্ত লোকের নিঃশব্দ ভীড়। অগুণতি ব্যস্ত লোক রাস্তায় চলাচল করছে কিন্তু কোন সাড়া নেই শব্দ নেই।

জানলার পাশে নিশ্চল পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম, ঐ যে মূক অথচ কর্মচঞ্চল জনতা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে আপন আপন কর্মে তার ভেতর পুরুষ এবং মহিলার সংখ্যার মধ্যে কোন তারতম্য তো দেখতে পাচ্ছিনা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। নিঃশব্দে চলেছে এই জনতার কাফেলা, কোন রকম ব্যস্ততা নেই বা হৈ চৈ নেই। অন্ধকারের মধ্যে এই চলমান জনতাকে দিয়েই গোটা জাতির চরিত্র অনায়াসে বিচার করা যায়। গম্ভীর কর্তব্যপরায়ণ জনতা চলেছে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনে—অযথা হৈ চৈ করবার সময় কোথায় তাদের?

সাড়ে আটটায় মারিয়া এসে হাজির হোল। ওকে দেখে আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হলাম, কারণ গতরাত্রের কথানুযায়ী ওর আসবার কথা

সাড়ে দশটায়। আমাদের এগারোটায় পৌছাতে হবে 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার অফিসে। আমার বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে মারিয়া জানালো যে আমাকে ব্রেকফাষ্ট খাওয়ানোর জন্য এবং সঙ্গদান করবার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে এসেছে। হোটেলের খাবারঘরে একা একা আমি অস্বস্তি বোধ করবো, তাই তার আগমন। সর্বত্র ওদের এই অতিথিপরায়ণতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

প্রাতরাশ সেরে উপরে এসে দেখি প্রধানা সম্পাদিকা একজোড়া আনকোরা নূতন জুতো এবং তাঁর নিজের একটা মোটা ফারের কোট পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার জন্য। অতিরিক্ত শীতে যেন অতিথির কষ্ট না হয় এটাই তাঁদের লক্ষ্য।

বার্লিন হোটেল থেকে 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার অফিসটি বেশী দূরে নয় শুনে আমি হেঁটে যাবার প্রস্তাব করলাম। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে হেঁটে গেলে ধীরে সুস্থে শহরটা বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। মারিয়া দেখলাম আমার প্রস্তাবে কোন আপত্তি জানালো না। নূতন দেশে পথদিয়ে হেঁটে যেতে বেশ ভালই লাগছিলো। তবে শীতের পরিচয় যা পেলাম তাতে দাঁতে খিল লাগবার মত অবস্থা।

অফিসের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই নজরে পড়লো লম্বা করিডোর আর তার দু'পাশে জনাকয়েক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। এঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে আমার কোটটা খুলে নিলেন কোট-ষ্ট্যাণ্ডে ঝোলানোর জন্য। মারিয়া একে একে সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো। এঁরা সবাই এখানকার কর্মচারী—পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে এঁরা কাজ করেন। এই পত্রিকাটি পৃথিবীর দশটি ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই দশটি ভাষা হচ্ছে রাশিয়ান, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানীশ, হাঙ্গারীয়, চাইনীজ, জাপানীজ, হিন্দী ও ওক্রেয়ান। খুব শিগ্‌গীরই আরও একটি ভাষার যোগ হবে, সেটা হচ্ছে উর্দু।

Scanned with CamScanner

ওদের সঙ্গে পরিচয়ের পর্ব শেষ করে মারিয়া আমাকে নিয়ে এলো প্রধানা সম্পাদিকার ঘরে। আমাদের দেশের তৈরী কয়েকটা জিনিস আমি তাঁকে উপহার দিলাম। উপহারগুলি পেয়ে খুব খুশী হলেন সম্পাদিকা। বিশেষ করে নারকেলের মালার মুখ এবং ঐ জিনিষেরই তৈরী নৌকো দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়েছেন দেখলাম, চোখেমুখে তাঁদের ফুটে উঠেছে অদম্য কৌতূহল।

প্রধানা সম্পাদিকার এই ঘরটি আকারে ছোট হলেও বেশ রুচিপূর্ণ। ঘরের এক কোণে একটি কাঁচের আলমারীতে বিভিন্ন দেশের উপহার সম্ভার সাজানো রয়েছে।

এইবার সকলে মিলে একটি বড় ঘরে এলাম। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল, তার উপর চায়ের সরঞ্জাম। আমাকে উপলক্ষ করেই আজ এই চা চক্রের আয়োজন। পত্রিকাটির বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদিকারা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা সবাই এসে যোগ দিলেন এই চায়ের মজলিসে। সকলের সঙ্গেই কিছু কিছু আলাপ করলাম। বলাবাহুল্য অধিকাংশ আলাপই দোভাষীর মাধ্যমে করতে হোল। ইতিমধ্যে পত্রিকার ফটোগ্রাফার ঝট্‌পট্ কয়েকটা স্ন্যাপ নিয়ে নিলেন।

প্রধানা সম্পাদিকা জানতে চাইলেন, আমি মোট কতদিন থাকতে পারবো তাঁদের দেশে। মাত্র দু' সপ্তাহ সময় দিতে পারি শুনে তাঁরা খুব হতাশ হলেন, বার বার বলতে লাগলেন, মাত্র দু' সপ্তাহ রুশ দেশ ভ্রমণের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অথচ এর বেশী সময় দেবার উপায় নেই আমার। ২৫ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে সুতরাং আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরতে হবে। এদিকে আবার ইউরোপটাও ঘুরে যাবার ইচ্ছা আছে। অগত্যা এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে কি করে বেশী স্থান পরিদর্শন করানো যায় তারই চেষ্টায় লেগে গেলেন ওঁরা।

নীনা ভরোনীনা প্রস্তাব করলো, প্রোগ্রাম তৈরী হতে থাক,

ততোক্ষণে এসো আমরা শহর প্রদক্ষিণ করে আসি। বলা বাহুল্য, তার প্রস্তাবটা আমি লুফে নিলাম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক—যিনি এতোক্ষণ এক কোণে চুপটি করে বসেছিলেন, এসে আমার সম্মুখে একটা কাগজ মেলে ধরলেন। কাগজের দিকে তাকিয়ে আমি তো হতবাক্! এতোক্ষণ ধরে উনি আমারই ছবি আঁকছিলেন অথচ আমি একটুও টের পাইনি। খুশী হয়ে ছবির তলায় নিজের নাম সই করে দিলাম। শিল্পীও খুশী হলেন।

মোটরের মহিলা ড্রাইভার দেখলাম এই প্রথমবার। নীনা তাকে আস্তে আস্তে গাড়ী চালানোর নির্দেশ দিলো আর পথের দু'পাশের দ্রষ্টব্য জিনিষগুলো আমাকে দেখাতে লাগলো। আমি যা দেখি তাতেই আশ্চর্য্য হই। মাত্র কয়েক বছরে এরা কত উন্নতি লাভ করেছে। নূতন এলাকায় যেখানে বাড়ীর পর বাড়ী তৈরী হচ্ছে নীনা দেখালো, সেখানকার ফ্ল্যাটগুলো সব ফ্যাক্টরী থেকে তৈরী হয়ে আসে। আস্ত ফ্ল্যাট সেখান থেকে তুলে এনে এখানে একটার উপর একটা বসিয়ে শুধু জোড়া লাগানো হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরী হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই সব বাড়ী দেখতে একই রকম। আমি চমৎকৃত হলাম তাদের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। আমাদের দেশে একটি বাড়ী তৈরী করতে হলে কত উদ্যোগ আয়োজন করতে হয় আর কত পরিশ্রম করতে হয় তার পিছনে। ঝড়, বৃষ্টি আর রোদ মাথায় করে বেচারা রাজমিস্ত্রীরা একটার পর একটা ইট সাজিয়ে তৈরী করে ইমারৎ। আর এখানে কোন চিন্তা নেই, পরিশ্রম সবই হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে, সদ্য তৈরী ফ্ল্যাট বেরিয়ে আসছে যন্ত্রের ভিতর থেকে। মিস্ত্রীদের একমাত্র কাজ হচ্ছে একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে দেওয়া।

ভাবতে অবাক লাগে, কত সহজে আর সুন্দর ভাবে এরা সাধারণ মানুষের বসতির সমস্যা সমাধান করেছে। এদেশের মানুষকে ফুট-

Scanned with CamScanner

পাতে বা গাছের তলায় শোবার স্থান খুঁজে নিতে হয়না। এই ধরণের হাজার ফ্ল্যাটওয়ালা হাজার হাজার বাড়ী তৈরী করা হয়েছে দেশের অগণিত জনসাধারণের বসবাসের জন্য।

কতকগুলো প্রধান প্রধান রাস্তা দেখিয়ে নীনা আমাকে জানালো, ঐ রাস্তাগুলো আগে ছিল অত্যন্ত সরু, এখন এত প্রশস্ত করা হয়েছে। কিন্তু রাস্তা প্রশস্ত করতে কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদ ভাঙতে হয়নি—শুধু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছুদূরে। কথাটা শুনতেও আশ্চর্য লাগছে। বিরাট বিরাট অট্টালিকা এমনি করে সরিয়ে দিয়ে প্রশস্ত করা হয়েছে পথগুলো। এ যেন রূপকথার গল্প কিন্তু আসলে এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। একটা দু'টো নয় পঞ্চান্নটা বাড়ী এমনি করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে একস্থান থেকে আর একস্থানে। অথচ তার ফলে ঐ বিরাট অট্টালিকাগুলোর কোন ক্ষতি হয়নি, সামান্য চিড়ও কোথাও খায়নি।

কেমন করে ঐ সব অলৌকিক্ ভানুমতীর খেলার মত ব্যাপার ঘটানো সম্ভব হোল জিজ্ঞেস করতেই নীনা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাকে বোঝাতে লাগলো ব্যাপারটা। কোন অট্টালিকা সরাতে হোলে প্রথমে তার তলা অবধি খুঁড়ে ফেলা হয়। তারপর সেই তলায় ইস্পাতের পাতদিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। এরপর ইস্পাতের পাতের তলায় বড় বড় চাকা এঁটে দিয়ে তার তলায় রেলের লাইন পেতে দেওয়া হয়। বাস্—গোটা অট্টালিকার তলায় চাকা লাগানো হয়ে গেল—এখন যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পার। তবে সবকিছুর মাপ-জোক ঠিক মত হওয়া চাই। হিসাবে সিকি ইঞ্চিরও গোলমাল হলে একেবারে সর্বনাশ। তাছাড়া সরানোর কাজটাও খুব ধীরে করতে হয়—তাড়াহুড়ো করতে গেলেই একেবারে তাসের ঘরের মত সবকিছু কুপোকাৎ।

গাড়ীতে বসেই নীনা আমাকে দেখাতে লাগলো এখানকার ছোট ছোট মহল্লা—এরা যার নাম দিয়েছে Micro Region। এক

একটি এলাকার সহস্র ফ্ল্যাটওয়ালা দশ-বারটি বাড়ী নিয়ে এই মাইক্রো রিজিয়ন গঠিত।

এই মাইক্রো রিজিয়নগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাচ্চাদের স্কুল, দোকান-ঘর, লাইব্রেরী, লণ্ড্রী, দর্জি প্রভৃতি যাবতীয় রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর সকল রকম আয়োজন আছে এখানে। দূরে যাবার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেকটি অট্টালিকার নিচের তলাদিয়ে এই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে আর উপরের তলাগুলো ফ্ল্যাটরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণ লোকের বসবাসের জন্য এই ফ্ল্যাটগুলো নির্ধারিত। এইসব দেখেশুনে ভারী ভালো লাগলো। ছোট বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর যে সমস্যা আমাদের ভাবিত করে তোলে এদের সম্মুখে সেই সমস্যা নেই। পাড়ার ভিতরই সুন্দর কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। তাই শিশুদের স্কুলে যাবার পথে গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়বার আশঙ্কা মায়ের মনে জাগ্রত হবার কোন সুযোগ নেই।

শহর ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী বাইরে এসে থামলো। নীনা জানালো যে এটা হচ্ছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তৈরী হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। এক অপূর্ব সৃষ্টি—আকাশ ভেদ করে উর্দ্ধলোকে চলে গিয়েছে এর চূড়া। সর্বসমেত ভবনটি বত্রিশ তলা উঁচু। গৌরব করবার মত জিনিষ, কোন সন্দেহ নেই তাতে। শুনলাম, সারা পৃথিবী থেকে ছেলেমেয়ে আসে এখানে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্য। বিশ হাজার ছেলেমেয়ে এখানে অধ্যয়ণ করছে। বিরাট এলাকা জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। জানতে পারলাম, এতবিরাট এলাকা নিতে হয়েছে তার কারণ এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কিছুর জন্যই বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না। তাদের জিনিষপত্র কেনাকাটা করবার জন্য দোকান, কাপড় ধোয়ানোর লণ্ড্রী, এমনকি সিনেমা দেখবার জন্য সিনেমা হাউস—

এই সবই আছে এই মহাবিদ্যালয়ের চত্বরে। এই সব দেখে শুনে আমি তো হতবাক্। কতটা দূরদর্শিতা থাকলে এমন প্ল্যান ও প্রোগ্রাম করে এ সব করা সম্ভব হয় সেটাই ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ী। ধীরে ধীরে এলাম মস্কো নদীর উপর। নদীর দু'ধারে গায়ের সঙ্গে গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা। সেকালের ধনীব্যক্তিরা নিজেদের বসবাসের জন্য এগুলো তৈরী করেছিলেন। আজ এগুলো কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়—এখন সবই সরকারের করায়ত্ত, তাই সবই সরকারের সম্পত্তি।

আমি দু'চোখে যা-কিছু দেখছি তাই ভাল লাগছে। হয়তো এই প্রথমবার এসব আমার নজরে পড়ছে তাই যা দেখছি তাতেই মুগ্ধ হচ্ছি, তন্ময় হয়ে দেখছি। নীনা আমার তন্ময়তায় আঘাত হেনে জানালো, দেড়টা বাজে, এখন ফেরা দরকার। কারণ, সাড়ে তিনটায় একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুল পরিদর্শনে যাবার কথা আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরতে হোল, কারণ হাতে সময় নেই। আমার অনিচ্ছাভাব দেখে নীনা কৌতুক বোধ করছিল—সে আশ্বাস দিলো যে আবার দেখা যাবে, হতাশ হবার কিছু নেই।

হোটেলে ফিরে খাওয়ার পর্ব চুকিয়ে আধঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলাম। তিনটায় মারিয়া গ্রিজুনোভা আবার এলো—আমাদের সাড়ে তিনটায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে। মারিয়ার সঙ্গে আরও এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। পরিচয়ে জানলাম, ইনি মার্ক গানকীন—তাদের পত্রিকার প্রধান আলোক-চিত্রশিল্পী।

মস্কোতেই একটি এলাকায় আমাকে যেতে হবে স্কুল পরিদর্শনে। প্রত্যেকটি মাইক্রো রিজিয়নেই একটি করে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল আছে। এসব স্কুলের নামকরণ করা হয় এলাকার নামানুসারে।

আমি যে স্কুলটি পরিদর্শনে গেলাম তার নাম 'অক্টোবর রিজিয়ন তীব'। স্কুল-প্রাঙ্গণে আমাদের গাড়ী থামতেই স্কুলের ডাইরেক্টার

বাওকাবা আস্তনীনা এবং সিনিয়র টিচার আসকানে মার্ত্তা কিওজারণে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিঘে চারেক জমির উপর স্কুলটি অবস্থিত। স্কুল বাড়ীটি তিনতলা। তিন থেকে আরম্ভ এবং আটবছরে শেষ—এই বয়সের ছেলেমেয়েরা এই স্কুলে আসবার সুযোগ পেয়ে থাকে। ছোট ছোট বাচ্চাদের মন ভুলিয়ে রাখবার জন্য এত রকমারী সব ব্যবস্থা আছে এতে যে একে স্কুল নামে অভিহিত না করে খেলাঘর বললেই মানাতো ভাল।

নিচের তলায় রান্নাঘর, শিক্ষয়িত্রীদের বসবার ও বসবাস করবার ঘর এবং একেবারে শিশুবিভাগ অবস্থিত। এই শিশুবিভাগে যে শিক্ষয়িত্রীরা কাজ করেন তাঁরাই নিচের তলায় থাকেন। ক্লাসঘরগুলি আকারে বেশ বড়। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। ছোট ছোট চেয়ার টেবিল সাজানো আছে কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়েই মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে খেলায় মগ্ন। দেয়ালের পাশ দিয়ে কাঠের র‍্যাকে নানারকম খেলনা সাজানো আছে। ছেলেমেয়েরা আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী ঐ র‍্যাক থেকে খেলনা সংগ্রহ করে খেলায় রত আছে। ঘরের এককোণে একটা মস্তবড় খাঁচায় একটি বড় টিয়া বসে আছে। মাছের এ্যাকুইরামে নানারকম মাছও আছে। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য এমনি নানা জিনিষ রক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া এসবের সাহায্যে বাস্তব জিনিষের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়—তারা অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাশের একটি ঘরে আছে বিরাট পিয়ানো। খেলাশেষে তাদের গান শোনানো হয়—শেখানোও হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

প্রত্যেক তলাতেই ক্লাস ঘরের সঙ্গেই লাগানো বড় হলঘর যাতে সারি সারি খাটপাতা আছে। খাটের উপর পরিষ্কার বিছানা পাতা। কতকগুলো বিছানার উপর সুন্দর সুন্দর খেলনাও রক্ষিত আছে। ঘরের চারদিকে বড় বড় কাঁচের জানালা—অর্থাৎ প্রচুর আলো বাতাসের ব্যবস্থা আছে। দেখে দেখে কেমন লোভ হতে

Scanned with CamScanner

লাগলো। কোন যন্ত্রবলে যদি ওদের মত এই দেশের শিশুতে পরিণত হতে পারতাম তাহলে কি মজাটাই না হতো।।

দোতালা ও তিন তলাতেও এই একই ব্যবস্থা। শুধু বয়স অনুপাতে খেলনার পার্থক্য আছে। দোতলার একটি ঘরে দেখলাম ছ'টি মেয়ে ঘরকন্না সাজিয়ে রান্নাবান্না খেলায় মেতে আছে আর তাদেরই পাশে বছর পাঁচেকের একটি শিশু কাঠের তৈরী কৃত্রিম পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

ক্লাসঘর গুলো দেখা শেষকরে আমরা বাচ্ছাদের খেলাধুলার জন্য তৈরী খোলা বাগানে এলাম। স্কুলঘরের পিছনে এই প্রাঙ্গণ সুন্দর সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত, মাঝে মাঝে ফুলের গাছও উঁকি মারছে। মাঝে মাঝে কাঠের বড় বড় ছাতালাগানো আছে। এই কাঠের বিরাট ছাতাগুলো এমন সুন্দর উজ্জ্বল রংয়ে রঞ্জিত যাতে সহজেই শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাই এই রংয়ের প্রাচুর্য। এছাড়া কাঠের ঘোড়া, দোলনা, সি—স (sea-saw) শ্লাইড প্রভৃতি সবরকম খেলনার আয়োজন এখানে আছে। আবহাওয়া ভাল থাকলে শিশুরা দিনের অধিকাংশ সময় এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই কাটায়। অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে সদা সতর্কদৃষ্টি দিয়ে প্রহরা দেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী।

এই সকল স্কুলে শিশুরা মনের আনন্দেই সময় কাটায়। এদেশের কর্মব্যস্ত মাতাপিতার নিজেদের শিশুকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কে দেখবে সারাদিন? কোথায় রেখে যাই? এই সব চিন্তার কোন স্থান নেই এদেশের মাতাপিতার হৃদয়ে। সকালবেলা কাজে যাবার পথে শিশুকে স্কুলে পৌছে দিয়ে পিতামাতা নিশ্চিন্ত আরামে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে শিশুকে ঘিরে দুঃশ্চিন্তার কোন সুযোগ নেই। তাঁদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা মনের আনন্দে খেলাধুলা করছে, লেখাপড়া শিখছে আবার সময়মত কিছুটা ঘুমিয়েও নিচ্ছে।

দিনের শেষে কর্মস্থান থেকে অব্যাহতি পাবার পর আপন আপন সন্তানকে গৃহে ফিরিয়ে আনছেন তাঁরা। এরমধ্যে আবার অনেক শিশু আছে যারা পুরো সপ্তাহই স্কুলে কাটিয়ে শনি-রবিবার শুধু বাপমায়ের সঙ্গে কাটাতে আসে। অবশ্য এই নিয়মটা আমার পছন্দ নয়। কারণ শৈশবকাল হচ্ছে চরিত্র গঠনের সময়। এই সময়টা মাতাপিতার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে সারা সপ্তাহ বোর্ডিংয়ে থাকলে তাদের মানসিক প্রতিফলন যথাযথ ভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ পায়না। এই সময় শিশুর মন অনেকটা কাদার মত থাকে— তার মনে তাই সবকিছুর ছাপ পড়ে তাড়াতাড়ি—তাই এই বয়সে মাতাপিতার সাহায্য একান্তই প্রয়োজন শিশুর জীবনে। অবশ্য কাজে ব্যস্ত মাতাপিতার পক্ষে সব সময় সন্তানকে সঙ্গদান করা সম্ভব হয়না, তবুও পুরো সপ্তাহ সন্তানকে বোর্ডিংয়ে ফেলে রাখলে সন্তানের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রায় দু'ঘণ্টা সময় শিশুদের মধ্যে এই শিশুরাজ্যে কাটলো। সাড়ে পাঁচটায় হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রে রুশদেশের বিখ্যাত অপেরা দেখতে যাবার কথা। মারিয়ার সঙ্গে 'বুফেইয়াৎ' অর্থাৎ খাবার ঘরে বসে বৈকালিক চা পান করলাম। এইবার মারিয়া বিদায় নিলো। অপেরাতে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য অন্য একজন মহিলা আসবেন। এবার ঘণ্টাখানেক অবসর। এ অবসরে বসে ছেলে-মেয়েকে চিঠি লিখলাম।

সাতটায় এলো নাজা বাজাশ্লোভাস্কা। নাজা 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার হিন্দী সংস্করণে কাজ করেন। বলা বাহুল্য, এঁর সঙ্গে হিন্দীতেই কথাবার্তা চালালাম। আমি অবশ্য ভাল হিন্দী জানি না। তবে আমার বাংলা ও উর্দু সংমিশ্রণে যে ভাষা তৈরী হচ্ছে তাকে হিন্দী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আমার হোটেল থেকে অপেরা ঘরটা বেশী দূরে নয়। তাই আমরা হেঁটেই রওয়ানা হলাম। মিনিট পাঁচেকের পথ কিন্তু

দারুণ কন্‌কনে শীতের দরুণ পথচলা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। শীতকে আরও অসহ্য করে তুলেছিল টিপ্‌টিপে বৃষ্টি। সমস্ত শরীরটা ফার কোটে ঢাকা, শুধুমাত্র নাকের ডগাটুকু বাইরে কিন্তু ঐটুকু মনে হচ্ছে যেন ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছে। অসহনীয় শীতের কামড়ে পাঁচ মিনিটের পথটুকুকে মনে হচ্ছিল পাঁচ ঘণ্টার পথ! এই পথটুকু অতিক্রম করে অপেরা হাউসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বারান্দায় পৌঁছানোর পর যথেষ্ট আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। গায়ের কোট ও স্কার্ফ খুলে জমা দিতে হোল নির্দিষ্ট স্থানে। এইবার হলের ভিতরে প্রবেশ করে আবার নূতন করে বিস্মিত হবার পালা। এ কোথায় এলাম? কাছে থেকে রাজা রাজ্‌ড়ার প্রাসাদ দেখবার সুযোগ কখনও হয়নি, কিন্তু কল্পনায় যে ছবি এঁকে রেখেছি তাকেও তো হার মানায় এখানকার চাকচিক্য। গোটা ঘরটার চারদিকে এত জাঁকজমকপূর্ণ কারুকার্যখচিত রয়েছে যে সেটা কল্পনাকেও হার মানায়। তাই ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াতে হোল। ভুল করে কোন কল্পনার রাজপ্রাসাদে ঢুকে পরিনি তো?

নাঃ, ভুল করিনি। গোটা ঘরটাই তো দর্শকে পরিপূর্ণ। গোটা অপেরা হাউস সর্বসাকুল্যে পাঁচতলা। প্রত্যেকটি ঝুল বারান্দা (Balcony) গাঢ় লাল ভেলভেটের কাপড়ে মোড়া এবং ধারগুলো সব সোনালী রঙে রঞ্জিত—মনে হয় যেন সোনা দিয়ে মোড়া। হল ঘরের সর্বত্রই এই ভাবে সাজানো। ঘরের চারদিকে ছাদ থেকে অজস্র বড় বড় বাতির ঝাড় ঝুলছে। এইগুলিও সোনালী রংয়ের। লাল আর সোনালী দু'টোই খুব উজ্জ্বল অর্থাৎ জমকালো রং। তাই সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মঞ্চের সম্মুখে হাত তিনেক পরিমাণ স্থান লাল কাপড় দিয়ে ঘেরা রয়েছে। উঁকি মেরে দেখলাম সেখানে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন বিভিন্ন বয়সের বাদ্যযন্ত্রী দল। এদের মধ্যে

অনেক মহিলাও আছেন। নাটক আরম্ভ হবার পূর্বে এঁরা ঐক্যতান বাজনা শোনালেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটক শুরু হোল। সেক্সপীয়েরের হাস্যকৌতুক নাটক অবলম্বনে আজকে নাটকের পালা শুরু হোল। বলা-বাহুল্য, ভাল লাগলো, প্রত্যেকটি শিল্পীই নিখুঁত অভিনয় করলেন। কোন রকম জড়তা নেই। এদের স্বাস্থ্য তাকিয়ে দেখবার মত। প্রত্যেকেই বিরাট বপুর অধিকারিণী। নায়িকা ভাবতেই আমরা তন্বী তরুণী কল্পনা করি, কিন্তু এদেশে তন্বীর দেখা পাওয়া মুস্কিল।

রাত বারটায় নাটক শেষ হোল। আবার সেই কন্‌কনে শীতে হাঁটবার পালা। হোটেলে পৌঁছেও আমার সঙ্গিনী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। আমার কামরায় আমাকে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। এখন থেকে আগামী কাল সকাল দশটা অবধি ছুটী।

১৭ই নভেম্বর। পূর্বরাত্রির মতই আলো-আঁধারি ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাতের কাছে কোন কাজ খুঁজে না পেয়ে 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকাগুলোর পাতা উল্টাতে লাগলাম। এই দেশের যে সকল মহিলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে সুনাম অর্জন করেছেন এবং বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত আছেন তাঁদের সকলের ছবি ও সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী পাওয়া গেল এগুলোর পাতায়।

ন'টার সময় মারিয়া গ্রিজুনোভা এসে ঢুকলো আমার ঘরে। হেসে অভিযোগ জানালাম, দশটা পর্যন্ত ছুটী জানিয়েছিলে, নটায় উপস্থিত হয়েছো কেন। মারিয়াও হেসে পাল্টা উত্তর করলো, ন'টায় না এলে তোমাকে ব্রেকফাষ্ট খাওয়াবে কে? তুমি তো খাবারের অর্ডার দিতে পারবে না। কারণ এই হোটেলের বয় বেয়ারা সবাই রুশ ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা জানে না, মেনুটাও রুশভাষায় ছাপানো। সুতরাং তোমার অসুবিধা হবে তাই নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে আমাকে আসতে হোল। এঁদের

আতিথেয়তার কাছে আমাকে হার মানতে হোল, যদিও ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। সকালে দু'কাপ চা পেলেই আমি খুশী কিন্তু সেকথা এঁরা শুনবেন কেন? এঁরা অতিথির প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যস্ত।

দশটার সময় Institute of Advance Education for Doctors-এর ডাইরেক্টার কভেরী গীনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চললাম। এই ভদ্রমহিলা কিছুদিন আগে পর্যন্ত এদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। প্রৌঢ়া হলেও শরীরের গাঁথুনি মজবুত অর্থাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রী স্বয়ং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। আলাপ করে প্রীত হলাম। তিনি জানালেন, এদেশের শতকরা পঁচাত্তর জন ডাক্তারই মহিলা। তাঁর এই মহাবিদ্যালয়ে গবেষণা করবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে ডাক্তাররা আসেন। দু'জন পাকিস্তানী ডাক্তারও বর্তমানে এখানে গবেষণা চালাচ্ছেন শুনলাম। কভেরী গীনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম একটি শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করতে।

মস্কো শহরের এক প্রান্তে এই হাসপাতালটি অবস্থিত। হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগ আছে। সংক্রামক ব্যাধিরও চিকিৎসা করা হয় এখানে কিন্তু এই বিভাগটি স্বাভাবিক কারণেই একটু দূরে অবস্থিত ছোট একটি অট্টালিকায়। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যেকটি বিভাগেই নানা রকম খেলনা ও রঙীন ছবি রাখা আছে। সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। খুব চেষ্টা করেও সামান্যতম ধূলিকণার সন্ধান পাওয়া যাবে না কোথাও। সব মিলিয়ে পরিবেশটি খুবই চমৎকার। ছোট হাসপাতাল সুতরাং বেশী সময় লাগলো না গোটা হাসপাতালটি ঘুরে দেখতে ও বুঝতে। তা সত্ত্বেও মারিয়া তাড়া দিতে লাগলো, বারটায় আমাদের একটা মিষ্টি তৈরীর ফ্যাক্টরীতে পৌছানোর কথা। এখানে আর দেরী করা চলবে না, কারণ ফ্যাক্টরীটা দূরে, কাজেই যেতেও কিছুটা সময় লাগবে।

যথাসময়ে মিষ্টি তৈরীর কারখানায় পৌছলাম। এই কারখানাটির নাম 'ক্রাসনি অক্টো' অর্থাৎ লাল অক্টোবর। মস্কো নদীর ধার ঘেঁসে কারখানাটি তৈরী হয়েছে। মস্কো নদী আমাদের মেঘনা গোমতী বা পদ্মার মত ভয়ঙ্করী নয়, এমন কি শীতলক্ষ্যা বা বুড়ীগঙ্গার মতও নয়। সরু নদী আর তার দুই পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত বিশালকায় সব অট্টালিকা। তার উপর আবার লোহার অসংখ্য পুল চলে গেছে নদীর বুকের উপর দিয়ে। পাঁচ পা না যেতেই একটা করে পুল। দেখলে মনে হয় যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। তাই তো নদীটির এত দুঃখ। মনের দুঃখে ম্লান বেচারা মনমরা হয়ে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। ওর বুকে যেন জমাট বেঁধে আছে অফুরন্ত ব্যথার অঝোর কান্না।

কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে এলাম। বলছিলাম 'লাল অক্টোবর' কারখানার কথা। নানা ধরণের টফি, লজেন্স, চকলেট—আরও বহু প্রকারের মিষ্টি তৈরী হয় এই ফ্যাক্টরীতে। গোটা মস্কো শহরে এই ফ্যাক্টরী খুবই পরিচিত। মোট ৪,০০০ শ্রমিক কাজ করে এই কারখানাতে, আর এই ৪,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৩,৭০০ জনই মহিলা। এক কথায় বলা চলে যে এই কারখানাটি মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত। কারখানার ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্বে আমাকে তাদের দেওয়া এ্যাপ্রণ পরতে হোল। বাইরে থেকে কোন রকম ধূলোবালি বা কোন প্রকার দূষিত বীজাণু যাতে কারখানার ভিতরে প্রবেশ না করতে পারে সেই জন্যই এই সাবধানতা। প্রধানা পরিচালিকার সঙ্গে কারখানার ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই সেখানে কর্মব্যস্ত সকল মহিলা আমাকে কলস্বরে অভ্যর্থনা জানালো। প্রধানা পরিচালিকা আমাকে সঙ্গে করে সমস্ত ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বিরাট কারখানাটি আর তারই মধ্যে কিভাবে নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরী হচ্ছে টফি, লজেন্স, চকলেট—সবই দেখলাম। এই কারখানার দু'টো বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম। একটি হচ্ছে, এখানে যারা

কাজ করছে তারা প্রায় সবাই মহিলা, কদাচিৎ এক আধজন পুরুষ কর্মী নজরে পড়ে। আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, এই কারখানায় তৈরী টফি, লজেন্স, বা নানা প্রকার মিষ্টি তৈরীর ব্যাপারে কোথায়ও হাতের কোন স্পর্শ লাগছে না। সকল কাজই মেশিনের মাধ্যমে সমাধা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করে বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। এখানকার কর্মীরাও যেন মেশিনে রূপান্তরিত হয়েছে বোধ হোল। কি রকম সব অদ্ভুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেশিন থেকে বেরিয়ে আসছে প্যাকেটে মোড়া টফির বাক্স বা রাংতায় মোড়া চকোলেট।

কারখানা দেখা শেষ করে আবার ফিরে এলাম প্রধানা পরিচালিকার ঘরে। এরই মধ্যে ঘরের মধ্যখানে অবস্থিত লম্বা টেবিলটি সাজানো হয়েছে নানা রকম ডিজাইনের টফি ও লজেন্সে। ভদ্রমহিলা সুনিপুণ হাতে আমাদের চা পরিবেশন করলেন। ঘরের এক কোণে কাঁচের আলমারীতে সাজানো আছে খুব সুন্দর কতকগুলো খেলনা। আমি খেলনাগুলোর প্রশংসা করতেই ভদ্রমহিলা স্মিত হাস্যে জানালেন যে ওগুলো মোটেই খেলনা নয়, সবই এই কারখানায় তৈরী সুস্বাদু মিষ্টি। তাজ্জব কাণ্ড—'ফাদার ক্রিসমাস্'কে ধরে একটা শিশু মনের আনন্দে খাচ্ছে, এটা কি ভাবা যায়? কিন্তু এটা তো সত্যি। নানা রকম খেলনা-মানুষ, পাখী, জীবজন্তু, ব্যাগ প্রভৃতির অনুকরণে তৈরী হয়েছে ঐ মিষ্টিগুলো। কেউ না বলে দিলে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন যে ঐ অপরূপ খেলনাগুলো সত্যিকার খেলনা নয় আসলে খাদ্যবস্তু অর্থাৎ মিষ্টি।

লোভী শিশুর মত দু'হাত ভর্তি নানা প্রকার মিষ্টির উপহার গ্রহণ করে হাসতে হাসতে লাল অক্টোবর কারখানা থেকে বিদায় নিলাম।

মারিয়া জানালো, লাঞ্চ খেতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী সুতরাং আমি যদি চাই তাহলে আমাকে নিয়ে যেতে পারে বিশেষ করে

শিশুদের জন্য তৈরী একটা দোকানে। প্রস্তাব শুনে আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আমি এসেছি দেখতে জানতে, কাজেই নূতন কিছু দেখবার প্রস্তাব শুনলেই আমার অজ্ঞাতেই মনটা খুশী হয়ে ওঠে, লাঞ্চ খাওয়া তো নিত্যকার ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 'দোতস্‌কিমিওর' অর্থাৎ শিশুদের পৃথিবী (Children's World) নামক দোকানে পৌছলাম। দোকানটি দেখে মনে মনে স্বীকার করলাম এর নামকরণ সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। সত্যিই এটা শিশুদের পৃথিবী। শিশুদের উপযোগী যা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে পাওয়া যাবে। তেমনি ক্রেতার সংখ্যাও প্রায় সবই শিশু, মাঝে মাঝে দু'একজন অভিভাবক সঙ্গে আছেন দেখা যায়। মস্কো শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত শিশুদের এই দোকানটি একটা চারতলা বিশালকায় অট্টালিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত। এক এক তলার গোটাটাই বিরাট হলঘর। হলঘরের সমস্তটাই শিশুদের প্রয়োজনীয় এবং মন ভোলানো সকল রকল উপকরণে সজ্জিত। এই দোকানের ডাইরেক্টার একজন অল্পবয়স্ক যুবক। তিনি নিজে আগ্রহ সহকারে আমাকে সমস্ত দেখালেন। ঘুরে দেখলাম—বই, খাতা, পেন্সিল থেকে আরম্ভ করে কাপড়চোপড়, জুতো, নানা প্রকার শিক্ষামূলক খেলনা প্রভৃতি সকল প্রকারের জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। পুরো চারতলা পর্যন্ত খুঁদে খরিদ্দারের ভীড়। এই ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়াই মুস্কিল কারণ শিশু ও কিশোরকিশোরীর জিনিষ কেনবার আগ্রহ ও আকুলতা তাদের চেহারায় ফুটে উঠেছে। সুতরাং তাদের কেনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুধু দেখবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সত্যি বড় মায়া লাগছিলো।

এক কথায় বলতে গেলে এটা ছোটদের ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর। ঘুরে ঘুরে আমিও শিশুদের সঙ্গে মিশে দু'চারটে জিনিষ কিনলাম আমার ছেলেমেয়ের জন্য। মস্কোয় অবস্থিত শিশুদের মন হরণকারী এই দোকানটির দ্রব্যসম্ভার সত্যিই তাকিয়ে দেখবার মত। দেখে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দেখে মনে তৃপ্তি আসে না অথচ ওদিকে ততোক্ষণে খিদেতে পেট চোঁ-চোঁ রব তুলেছে। কাজেই আবার আসবো মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেদিনকার মত ঐ দোকান থেকে বিদায় নিলাম।

হোটেলে ফিরে খাওয়ার পালা শেষ হতেই আমার সঙ্গিনী মারিয়া জানালো, এখন একটানা দু'ঘণ্টা বিশ্রাম। পাঁচটায় যেতে হবে প্যালেস অব পাইওনিয়ার্স (Palace of Pioneers) দেখতে। নামটা কি রকম অদ্ভুত—কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এদেশের কাণ্ড কারখানাই আলাদা-অদ্ভুত ধরণের। সুতরাং আর বিস্মিত হয়ে লাভ নেই—শুধু দেখে যাও।

পৌণে পাঁচটায় দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনে দরজা খুললাম। হাসিমুখে মারিয়া গ্রিজুনোভা জানালো, এখন যাত্রার সময় হয়েছে। আমি তৈরীই ছিলাম, দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে দরজায় অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠে বসলাম। লক্ষ্য করলাম গাড়ীর ড্রাইভার মহিলা—অবশ্য এদেশে এই দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। এদেশের মহিলারা অত্যন্ত কর্মঠ এবং কর্তব্যপরায়ণা। আমাদের দেশের কাব্যে বর্ণিত "ললিত লবঙ্গ লতার" মত এরা নয় মোটেই। এরা পুরুষের পাশাপাশি সব রকমের কার্য্যভার আপন স্কন্ধে তুলে নিচ্ছে। কোন অসুবিধা বা কোন রকমের বাধা সৃষ্টি হয়নি তাদের কাজের পথে। মেয়েদেরকে এরা সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছে, কাজেই মেয়েরা মানুষের মর্যাদা পেয়েছে। তাই পথে-ঘাটে সর্বত্রই পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি মহিলাকর্মীও নজরে পড়ছে।

বিশ্বের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা একটু নাড়াচাড়া করেন তাঁরা সবাই একথা জানেন যে রুশ দেশের শিশুরা হচ্ছে সবচেয়ে আদরণীয়। সকল কিছুর উপরে জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের স্থান। তাদের শিক্ষা ও রোগে চিকিৎসার সকল দায়িত্ব সরকারের। এখানেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়নি। শিশুদেরকে প্রকৃত দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে গড়ে তোলবার কার্যভার সরকার আপন হস্তে গ্রহণ করেছে। তাই দেশের সর্বত্র নানারকম ব্যবস্থা করা হয়েছে শিশুদেরকে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে গড়ে

তোলবার। রুশ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান শহরেই প্যালেস অফ্ পাইওনিয়ার্স খোলা হয়েছে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা বাজতেই আমাদের গাড়ী গিয়ে থামলো মস্কো শহরের প্যালেস অফ্ পাইনিয়ার্সের প্রাঙ্গণে। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ী থামতেই তিনি এগিয়ে এসে দরজা খুলে ধরে আমাদের স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। গাড়ী থেকে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করে একটু চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ রয়েছে এই তিনতলা অট্টালিকাটির সম্মুখভাগে।

এরপর শুরু হোল ঘুরে ঘুরে দেখবার পালা। তিনতলা এই প্রাসাদটিতে শতাধিক কামরা আছে। এর প্রত্যেকটি কামরাতে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে পারদর্শী করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে। গান বাজনা থেকে আরম্ভ করে ডিবেট, নাটক, রেডিও মেকানিজম, এ্যারোপ্লেন তৈরী করা, খেলনা তৈরী করা, দাবা খেলা, পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করা রান্নাবান্না শেখা প্রভৃতি সকল রকম বিষয়ে এখানে শিক্ষাদান করা হয়।

শিশুরা অবসর সময়ে এখানে হাজিরা দেয় এবং যার যে বিষয়ে আগ্রহ আছে সেই বিভাগে স্বেচ্ছায় যোগদান করে পারদর্শিতা লাভ করে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে ক্রমাগত কয়েক বৎসর একই বিষয়ে শিক্ষালাভ করবার পর শিশুটি বয়সে কিশোর থাকলেও কর্মে ও বাস্তবে সে একটি বিশেষজ্ঞতে পরিণত হয়েছে। এভাবে ভবিষ্যতের গোটা জাতিটাই বিশেষজ্ঞরূপে তৈরী হচ্ছে। সুতরাং এই জাতি যে উন্নতি লাভ করবে সেতো বলাই বাহুল্যমাত্র। কোনরকম বাধ্যবাধকতা নেই—অনেকটা ক্লাবের মত। তাই সহজেই এদেশের শিশুদের মনকে এরা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এখানকার সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাই অবৈতনিক। উপরন্তু

Scanned with CamScanner

এখানে শিক্ষারত শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে হাল্কা ধরণের খাবার পরিবেশনেরও ব্যবস্থা আছে। এরজন্য অভিভাবকদের এক পয়সাও ব্যয় করতে হয় না। প্যালেস অফ পাইওনিয়ার্সের দরজা পর্যন্ত শিশুদের পৌঁছে দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত।

নিজেদের দেশের কথা স্বভাবতই মনে পড়লো। কত দরিদ্র পিতামাতার মেধাবী সন্তান শুধুমাত্র সুযোগ ও সুবিধার অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারলো না—অকালে ঝরে গেল। অথচ হলফ্ করে কে বলতে পারে যে যারা ঐ অবহেলিত ও অনাদরে পড়ে রইলো তাদের ভেতর নজরুল, ইকবাল, জয়নুল আবেদীন বা কায়দে আজম জন্মলাভ করতেন না। শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কত মুকুল ঝরে গেল, কত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোল না, ভেবে মনটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয় বই কি।

বিভিন্ন ক্লাশ পরিদর্শন করলাম। নাচের ঘরে ঢোকামাত্র টিচারের আদেশক্রমে একদল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে নাচের ভঙ্গীতে আমাকে 'বাও' করে নাচ দেখাতে শুরু করলো। প্লেন তৈরীর ঘরে বিরাটাকার থেকে আরম্ভ করে নানা আকারের প্লেন দেখতে পেলাম। বাচ্চারা সবাই গভীর মনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করছে হাতে কলমে। একটা ঘরে 'Space Ship' যেটা রুশ দেশের গৌরবকে দশগুণ বর্দ্ধিত করেছে সেই বিষয়েও কিছুটা জ্ঞানদান করা হচ্ছে দেখলাম। রান্নার ক্লাশে ঢুকে খাবারের আস্বাদ গ্রহণ করতে হোল। বলা বাহুল্য এখানকার অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছাত্রীদলভুক্ত। সব চেয়ে মজা লাগলো খেলনা তৈরীর বিভাগে। নানা রকম গাছগাছরা ও পরিত্যক্ত জিনিষপত্রের সাহায্যে শিশুরা তৈরী করছে অতীব সুন্দর মনোমুগ্ধকারী খেলনা। এই সব দেখে শুনে মনটা তৃপ্তিতে ভরে গেল—গোটা জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার মূলমন্ত্র এদের জানা আছে।

আজকে নভেম্বরের আঠারো তারিখ।

বেলা ন'টায় 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার অন্যতমা কর্মী নাজা

বাজাভালাস্কা এলো আমার কাছে। আজ মারিয়া এবেলা ব্যস্ত আছে অফিসের কাজে তাই নতুন সঙ্গিনী নাজার উপস্থিতি। প্রাতঃরাশ শেষ করে আমরা পথে নামলাম। নাজা গাড়ীতে যাবার প্রস্তাব করেছিল, আমি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। গাড়ীতে ভ্রমণ করে সুখ পাওয়া যায় না, সবটা ভাল করে দেখা হয় না। অবশ্য দূরের পথ হলে তো গাড়ী ছাড়া উপায়ই নেই। কিন্তু আজ আমরা যাচ্ছি ইতিহাস বিখ্যাত ক্রেমলীন দেখতে এবং সেটা আমার হোটেল থেকে বেশী দূরে নয়, মাইল খানেকের পথ। নাজা অতিথিবৎসলতার দরুণ বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো গাড়ীতে যাবার জন্য—কিন্তু আমি তার পীড়াপীড়িকে বিশেষ আমল দিলাম না। তাকে বুঝিয়ে বললাম, চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ী করে ঘুরে বেড়ালে একটা নূতন দেশ ভ্রমণের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ চেহারা ভাল মত দৃষ্টিপথে পড়ে না—আমি তো তা চাই না।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম। গত্যন্তর না দেখে নাজাও আমার সঙ্গ নিল। দারুণ শীতে কাঁপুনি ধরেছে। পুরু ফারকোটে আমার সর্বাঙ্গ ঢাকা—কিন্তু তাতেও শীত মানছেনা। আরও ভালকরে সর্বাঙ্গে কোটটা জড়িয়ে নিলাম—আমার অবস্থাটা দাঁড়ালো অনেকটা বালির বস্তার মত।

মিনিট সাতেক হাঁটবার পরই এসে পৌছালাম রেড স্কোয়ারে। রেড স্কোয়ারে পা দিয়েই অপূর্ব এক অনুভূতি জাগলো মনে। এই সেই বিখ্যাত রেডস্কোয়ার যেখান থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ষ্টালিন নিত্য নূতন নূতন ঘোষণা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে তাক্ লাগিয়ে দিতেন। এই সেই রেডস্কোয়ার যেখানে প্রত্যেক বৎসর বিপ্লব দিবসকে উপলক্ষ্য করে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হয় আর আমরা পৃথিবীর আর এক-প্রান্তে বসে দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই কুচকাওয়াজের ছবি দেখে বিস্মিত হয়ে কতো কি ভাবি—এই রেডস্কোয়ারটার পরিধি ও

Scanned with CamScanner

আসলরূপটা মনের কোণে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করি। রাস্তা তো নয় যেন বিরাট একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ। অনেকটা আমাদের রমনার মাঠের মত। পার্থক্যটা হচ্ছে যে এর আগাগোড়া সবটাই পাকা সিমেন্ট বাঁধান। হ্যাঁ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে গর্ব করবার মত বটে। প্রশ্নকরে জানতে পারলাম প্রায় আধ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ৭৫ ফিট্ পরিধি বিশিষ্ট এই স্কোয়ারটি।

রেড স্কোয়ার। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম রাস্তার রংটা নিশ্চয়ই লাল। কিন্তু কই, সে রকম লাল রং তো কোথায়ও দেখতে পাচ্ছিনা। আমার কথাশুনে হেসে ফেললে নাজা অর্থাৎ আমার সঙ্গিনী। বোকার মত বলেছি নাকি? আরে না, না—রুশ ভাষায় 'রেড' শব্দের অর্থ লাল নয়, ওর অর্থ হচ্ছে সুন্দর। এই রাস্তাটা খুব সুন্দর কিনা তাই আমরা ঐ নাম দিয়েছি। ও-তাই বলো—তা হলে নামকরণটা সার্থক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের পূণ্যস্থান এই রেড স্কোয়ার। বিপ্লবের বীর সেনানীরা সব শুয়ে আছেন এখানে, একজনের সঙ্গে আর একজন গা ঘেঁসে শুয়ে আছেন। গাড়ী বোঝাই করে শবদেহ আনা হয়েছে আর পাইকারী ভাবে তাদের কবর দেওয়া হয়েছে এখানে। দেশাত্ম-বোধক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে তারা প্রাণ দিয়েছে। আত্মোৎসর্গ করেছে দেশের জন্য দশের জন্য। সেই প্রাণদান বিফলে যায়নি—তারই প্রমাণ আজকের রুশদেশ। আজ তাঁদেরই জয়-জয়কার। তাইতো প্রত্যেক সোভিয়েৎবাসীর একমাত্র কামনা যে মৃত্যুর পর যেন এই 'রেডস্কোয়ারের' এক কোণে একটুখানি স্থান পায়। এই আকাঙ্খার দরুণই অনেকের নশ্বর দেহ পুড়িয়ে তার ছাই এনে রাখা হয়েছে তাদের অন্তিম ইচ্ছাপুরণের জন্য। বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির দেহভস্মও এখানে দেয়ালের মধ্যে রক্ষিত আছে।

রেড স্কোয়ারের একধারে ম্লান অবসন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে নয়চূড়া বিশিষ্ট সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রেল। এই সেণ্ট বেসিলের

চূড়াগুলো নানা রংয়ে রঞ্জিত হলেও তার মধ্যে দীপ্তি নেই, আছে একটা বিষণ্ণ ভাব। ক্যাথিড্রেলের একপাশে রয়েছে আইভান-দা-টেরিবলের গির্জা। আইভান-দা-টেরিবলের নাম জানেনা এমন লোক শিক্ষিত সমাজে বিরল। এই গির্জার নাম বেসিল ক্যাথিড্রেল। এই বেসিল ক্যাথিড্রেলের সম্মুখে একটু উঁচু বেদীর স্থান করা আছে। এইখানেই আইওয়াই আজম মানুষের মাথা কাটতেন। অবিশ্বাস্য ধরণের অত্যা-চারী ছিলেন এই জার। মানুষকে চরম কষ্ট দিয়েও তাঁর তৃপ্তি হতো না—আরও আরও কষ্ট কি করে দেওয়া যায় তারই ফন্দী ফিকির খুঁজতেন তিনি। কাউকে একবারে হত্যা করে সুখ হতোনা তাঁর। অপরাধীকে তাঁর আদেশ মত প্রথমে উঁচু বেদীর মাঝখানে বাঁধা হতো, তারপর ধীরে ধীরে চলতো বীভৎস অত্যাচার। প্রথমে হাত পা কাটা হতো, তারপর নাক কাটা হতো, এমনিকরে প্রথমে বিভিন্ন অঙ্গচ্ছেদ করে, অমানুবিক অত্যাচার করে সবশেষে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হতো। অনেকে এই অত্যাচার অসহ্য মনে করে আগেই প্রাণ দিত। অনেক—অনেক রক্ত গড়িয়ে গেছে এই বেদীর উপর। তাইতো পরবর্তী কালে এই জারের আইওয়াই আজম নাম বদলে নূতন নামকরণ করা হোল আইভান-দা-টেরিবল।

বহু অত্যাচারের স্থল এই বেসিল ক্যাথিড্রেলকে বর্তমানে যাদু-ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মস্কো শহরে যাদুঘরের ছড়াছড়ি আছে। ঐতিহাসিক যাদুঘরতো আছেই এরপর আছে কৃষি বিষয়ক যাদুঘর, শিল্প ও শ্রম বিষয়ক যাদুঘর (Industrial Museum) 'নাট্যবিষয়ক যাদুঘর (Theatrical Museum) টেক্সটাইল যাদুঘর, —এমনিতর হাজারও রকমের যাদুঘর আছে সেখানে।

বেসিল ক্যাথিড্রেল বাঁয়ে রেখে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে পড়বে ক্রেমলীন। ক্রেমলীনের অনেকগুলো প্রবেশপথ আছে। রেডস্কোয়ার সম্মুখে করে রয়েছে যে প্রবেশপথটি তারই চূড়া বহু দূর থেকে পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রবেশপথটির

নাম স্প্যাস্কিয়া গেট। ১৪৯১ সালে এই স্প্যাস্কিয়া গেটের চূড়া নির্মিত হয়েছিল। চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে ১০৫ ফিট।

স্প্যাস্কিয়া গেটকে বাঁয়ে ফেলে আর একটু এগুলেই দেখতে পাওয়া যাবে লেলিনের স্মৃতি ভবন। ক্রেমলীনের দেওয়াল ঘেঁসে গম্ভীর, ম্লানবদনে দাঁড়িয়ে আছে এই স্মৃতিভবন। স্মৃতি ভবনটির দরজার ছু পাশে ছুজন সশস্ত্র প্রহরী। মনে অদম্য আকাঙ্খা ছিল রুশ বিপ্লবের নেতা, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাণ, এবং পৃথিবীর নির্য্যাতিত মানবজাতির দরদী বন্ধুর চিরনিদ্রায় শায়িত দেহকে একবার চাক্ষুষ দেখে নেবার, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আকাঙ্খা আমার পরিতৃপ্ত হোলনা। স্মৃতিভবনের ভিতরে মেরামতের কাজ হচ্ছে, আপাততঃ দর্শকদের জন্য দরজা বন্ধ। ছু'মাস পর আবারখোলা হবে দরজা সাধারণের দর্শনের জন্য।

এই স্মৃতিমন্দিরে লেলিন ও ষ্ট্যালিনকে শোয়ানো হয়েছিল পাশাপাশি। কিছুদিন পূর্বে সারাদেশব্যাপী ষ্ট্যালিন বিরোধী মনোভাব দেখা দেওয়ায় বর্তমানে এখান থেকে ষ্ট্যালিনের দেহ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রেড স্কোয়ার পার হয়ে এলাম গোর্কীরোডে। মস্কোর, এমনকি গোটা রুশদেশের সবচেয়ে বনেদী রাস্তা এই গোর্কী রোড। রাস্তার ছু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক প্রাসাদগুলি। রুশদেশের জনগণের মনহরণকারী সবচেয়ে বড় দোকান "গুম" (Gum) এই রাস্তার উপরই অবস্থিত। দোকানের সম্মুখে ক্রেতার বিরাট লাইন। ক্রেতার এই বিরাট লাইন লক্ষ্য করেছি সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র। সকল দোকানের সম্মুখেই ক্রেতার লাইন দাঁড়িয়ে আছে কাতার বেঁধে। দোকানে দোকানে ক্রেতার ভীড়, তাই এই লাইন (Que) লাগানোর ব্যবস্থা। এরা হৈ চৈ পছন্দ করেনা, সবকাজ নিরিবিলিতে শান্তিপূর্ণভাবে করতেই ভালবাসে। তাই নিঃশব্দে জনতা এগিয়ে চলেছে পা-পা করে। তারপর দোকানীর সম্মুখে পৌঁছানে

মাত্র চক্ষের পলকে দোকানী ক্রেতার ফরমাস মত মাল তার হাতে তুলে দিচ্ছে। ক্রেতাও নির্ধারিত মূল্য দোকানীর হাতে তুলে দিয়ে নিঃশব্দে সরে দাঁড়াচ্ছে পিছনের লোককে এগিয়ে আসবার সুযোগ দিয়ে। এই নিঃশব্দতা বিরাজ করছে সর্বত্র। রাস্তায় যানবাহন চলেছে অনবরত কিন্তু কোনরকম উৎকট শব্দ নেই, এমনকি হর্ণের আওয়াজও শোনা যায় না। জনতার ভীড় রয়েছে, পথে, কর্মব্যস্ত জনতার ভীড় কিন্তু নীরব জনতা। মনে হয় যেন শোকমিছিল চলেছে।

গোর্কী রোড অতিক্রম করতেই দেখা মিললো গোর্কী পার্কের। গোর্কীর খুব প্রিয় স্থান ছিল এই পার্কটি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এই পার্কটিতে। পার্কের বিভিন্নস্থানে আরও বহু সুন্দর সুন্দর মর্মর মূর্তি আছে। বর্তমানে এই মূর্তিগুলোকে কাঠের ফ্রেমে ঢেকে রাখা হয়েছে—দূর থেকে দেখতে অনেকটা বোরখার মত মনে হয়। শীতের মরশুম তাই পার্কের চেহারা এখন বিষণ্ন। অনেকটা আমাদের দেশের ঝড়ো কাকের মত চেহারা। তাই এই সময়টা ওই মূল্যবান মূর্তিগুলোকে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়। শীত বিদায় নিলেই বোরখা উন্মোচন করে হেসে উঠবে মর্মর মূর্তিগুলো, আর তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিয়ে খুশীর হিল্লোল হইয়ে দেবে সারা পার্কের গাছপালা।

অবশেষে আমাদের গন্তব্যস্থল ক্রেমলীনের প্রধান দরজায় এসে পৌছলাম। এই দরজাতেও সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রবেশে কোন বাধা দিল না তারা। দরজা পার হয়ে ক্রেমলীনের অন্দরে প্রবেশ করলাম।

১১৪৭ অব্দে ইউরীদ আল গোর্কী প্রথম ক্রেমলীনের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই সময় ছোট্ট একটা দুর্গ ছিল ক্রেম্‌লীন। ক্রমে চেহারা পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে আজ অতিকায় চেহারা ধারণ করেছে। সোভিয়েট সরকারের সকল কাজ কারবার এখানেই। এখানেই

Scanned with CamScanner

তাদের মূল ঘাঁটি। পুরো ক্রেমলীনটাই ৬৫ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আর এই প্রাচীরের পরিধি হচ্ছে সোয়া মাইল।

ক্রেমলীনের অভ্যন্তরে এখানে সেখানে বহু প্রাচীন গির্জ্জার ছড়াছড়ি। এই গির্জ্জাগুলোর আকাশ ভেদী চূড়া সগর্বে সকলকে দেখিয়ে দিচ্ছে তাদের ঐশ্বর্য্যময় রূপ। এই চূড়াগুলোর মাথায় শোভা পাচ্ছে একটি করে বিরাট আকারের লাল তারকা।

খুব গম্ভীর, অথচ জাঁক-জমকপূর্ণ পরিবেশ। সরকারের যতসব বড় বড় সভা, শলা পরামর্শ বা আদর আপ্যায়ণ সব এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। লোকে বলে গোটা মস্কো শহরটাই নাকি সাতটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রেমলীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাতটি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে। "There is nothing above Moscow except the Kremlin, and nothing above the Kremlin except Heaven." অর্থাৎ "ক্রেমলীন ব্যতীত মস্কো অপেক্ষা উঁচু কিছু নেই, আর একমাত্র বেহেস্ত ব্যতীত ক্রেমলীন অপেক্ষা উঁচু আর কিছু নেই।" এদেশের লোকদের এটাই বিশ্বাস। ক্রেমলীনের উপর তাদের অসীম শ্রদ্ধা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। আমার মত আরও অনেক বিদেশী দল কিন্তু এদিক ওদিক নজরে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। এই তো—এই সেই ঐতিহাসিক ঘন্টা।

পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টিকারী সর্ববৃহৎ লৌহ ঘন্টা। এই বৃহৎ লৌহ ঘন্টাটির ওজন হচ্ছে ২০০ টন। রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রনে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘন্টাটী তৈরী করা হয়। প্রথমে মাটীর উপরই এর প্রস্তুত পর্ব সমাধা করা হয়। তারপর ঘন্টা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ঘষামাজা করে ছিমছাম করে তোলার জন্য তাকে বসানো হোল সিমেন্টের ফ্রেমের উপর। অনেক দিন ধরে চলতে লাগলো ঘষামাজার কাজ—আর অনেকদিন লাগবেই তো—এতো যে-সে ঘন্টা নয়—স্কুলের পিরিয়ড

ঘোষণার ঘন্টাও নয়, এ হচ্ছে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যবস্তুর অন্যতম আশ্চর্য ঘন্টা। পাঁচ-ছয় জন মানুষ অনায়াসে ওর ভিতরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে। ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। এই আমার সপ্তম আশ্চর্য্য বস্তুর দ্বিতীয় বস্তু দর্শন। প্রথমটা দেখেছি আগ্রাতে। সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টিকারী মর্মর স্মৃতি তাজমহলের রূপ দেখে সেদিন সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এখন থাক সে কথা।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বৎসর আগে বিখ্যাত কারিগর আইভান মোটোরিণ এবং তাঁর ছেলে মিখাইলের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে এই বিস্ময় সৃষ্টিকারী ঘন্টা।

ঘন্টা তৈরী হয়ে যাবার পর ঘষামাজার কাজ চলেছে পুরোদমে। হঠাৎ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ড ঘটলো মস্কো শহরে। আগুনে ফেটে গেল ঘন্টাটি, তারপর ছিটকে পড়লো মস্কো নদীর পানিতে ভর্তি এক নালার মধ্যে। অতবড় দানবাকার ঘন্টার বুক ফেটে বেরিয়ে এলো সাড়ে এগারো টনের এক টুকরো। পুরো একশো বছর ঐ ফাটা টুকরোটাকে পাশে নিয়ে শুয়ে থাকতে হলো হতভাগ্য ঘন্টাটিকে ঐ নালার ভিতরে। তাকে তুলবে এমন সাহস কারও হোল না।

একশো বছর পার হয়ে যাবার পর ঘন্টাটির বরাত ফিরলো, নবজন্ম হোল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আবার তাকে তোলা হোল নালা থেকে। কিন্তু ঝোলানোর আশা পরিত্যাগ করতে হোল। সিমেন্ট বাঁধানো বেদীগেঁথে তাতেই তাকে মহাসমারোহে বসিয়ে দেওয়া হোল। এ যেন ঘন্টামহারাজের সিংহাসনে উপবেশনের মত। ভাঙা টুকরোটী স্থান পেল ঘন্টামহারাজের পায়ের তলায়। সেই থেকে ঘন্টামহারাজ ও তার পুত্র দু'জনে মিলে সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে।

এই লৌহ ঘন্টার পিছনে আইভান ভেলিকীর গির্জ্জা। এই ঘন্টা-গির্জ্জা তৈরী করা হয়েছিল ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তখনকার জার বোরিস

গুত্তোনোভএর হুকুমে। এই গির্জাতে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৩৩টি ঘন্টা আছে। সবচেয়ে বড় ঘন্টাটির ওজন ৬৫ টন।

এইগুলো দেখা শেষ করে দশ পা এগিয়ে যেতেই নজরে পড়লো আবার এক এলাহী কাণ্ড। মান্ধাতা আমলের এক কামান দৃষ্টিপথে পড়লো কিন্তু কামানটির পাশে ঐগুলো আবার কি? ঐ যে বড় বড় গোল, কি জিনিষ এগুলো? এগুলো কামানের গুলি শুনতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে বিরাট পরিধি এই গোলাগুলোর বেড় পাওয়া কঠিন। সেই যুগের মানুষগুলো কি দানব ছিল? এগুলো তারা তুলতো কি করে, আর কামানে ঢুকাতোই বা কি করে? সত্যিই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। ভাবতে পারি না আমি সেই সব শক্তিমান মানুষের কথা।

বহু বিদেশী টুরিষ্ট ঘোরাফেরা করছে চারদিকে। এই সব বৃহদাকার এলাহী কাণ্ডের কোন বস্তু দৃষ্টিপথে আসা মাত্রই তাদের ক্যামেরা ক্লিকক্লিক শব্দ করে ওঠে। ওরই মধ্যে দু'একজন আবার আমারও ছবি তুলে নিচ্ছে বুঝতে পারছি কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। শাড়ী পরিহিতা মহিলা তাদের চোখে একটা নূতন আবিষ্কারের মতই, সুতরাং ছবি তুললে অপরাধ কোথায়?

সেই বৃহদাকার কামানকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দেখলাম পুরানো আমলের বহু গির্জাই এখানে তাদের অতীতের প্রাচুর্যের ম্লান রূপ নিয়ে আজও দর্শককে নীরব আহ্বান জানাচ্ছে দেখ, দেখে যাও এককালে আমাকে ঘিরে কত উৎসব কত সমারোহ ছিল। আজ আর তার পরিচয় পাবে না, তবুও যদি দেখবার দৃষ্টি থাকে, যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে দেখ আর উপলব্ধি কর আমি এক কালে কী ছিলাম।

উস্‌পেনেসি ক্যাথিড্রেল স্থাপিত হয়েছে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে। এরও ত্রিশ বছর আগে তৈরী হয়েছে বল্‌গোভেশ্চেনেস্কি ক্যাথিড্রেল। এর পর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে আর্ক এঞ্জেল ক্যাথিড্রেল। এমনি

আরও বহু ক্যাথিড্রল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। ক্রেমলিনের সর্বত্রই ক্যাথিড্রেলের ছড়াছড়ি। এই সব পৌরাণিক ক্যাথিড্রেলের ভিতরের দেওয়ালে আছে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ধর্মীয় ছবি। ছবিগুলো এত উন্নত ধরণের যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। শুধু দেখেই যাও। এত যুগ, এত বছর অতীত হয়েছে, তবুও আজও তারা রংয়ে ও রূপে উজ্জ্বল, অম্লান। আশ্চর্য এদের রংয়ের বাহাদুরী। কত শতাব্দী পেরিয়ে এসে আজও তারা নূতনের মতই উজ্জ্বল অম্লান।

দু'একটা ছবির সামান্য কোথাও হয় ত নষ্ট হয়েছিল কিন্তু এদেশের লোকেরা সে নষ্টকে বরদাস্ত করতে পারে নি। খেটেখুঁটে গবেষণা করে আবার ফিরিয়ে এনেছে তার আসল রূপকে। অতীতের জিনিষের প্রতি এদের বড় মায়া, বড় দরদ। কিছুতেই তাকে ধ্বংস হতে দিতে এরা রাজী নয়। অতীতকে এরা আঁকড়ে থাকে, ধরে রাখতে চায় বর্তমানের মাঝে। গর্ব-ভরে জাহির করে অতীত ঐতিহ্য প্রাচুর্য ও গাম্ভীর্যকে।

দেখলাম সুপ্রীম সোভিয়েটের অফিস। যেখানে বসে সোভিয়েটের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের গোপন বৈঠক ও শলাপরামর্শ করেন। এখানে বসেই গোটা দেশটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

হাউস অফ কংগ্রেস এবং আরও বহু প্রাচীন ইমারত দেখা শেষ করে অবশেষে এলাম ক্রেম্‌লীনের ইতিহাস সৃষ্টিকারী যাদুঘর দেখতে। বহু বিচিত্র সম্পদে পূর্ণ এই যাদুঘর। ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সমারোহ। বহু মূল্যবান প্রাচীন সংগ্রহ এখানে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন চিত্র, ধাতু নির্মিত জিনিষপত্র, কাঠের কাজ, সোনা রূপা ও মণিমুক্তা খচিত জিনিষপত্র এখানে আছে। এগুলো ছাড়া প্রাচীন কালের নানা ধরণের অস্ত্রসস্ত্রও স্থান পেয়েছে এখানে। পৃথিবীর নানা স্থান থেকে এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া হাজার বছর আগে থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত দেশের

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শিল্প ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটা এখানেই দৃষ্টিগোচর হয়। পিটার দ্যা গ্রেট হচ্ছেন এই যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় এই যাদুঘরে।

বাইরের ধূলোবালি মাখানো জুতো নিয়ে এখানে প্রবেশ করা চলেনা। নিজের জুতো খুলে রেখে এখানকার কাপড়ের জুতো পরে নিতে হয় প্রথমেই।

প্রথমে যে ঘরে প্রবেশ করলাম সেটা হচ্ছে অস্ত্র শস্ত্রের ঘর। প্রাচীনকালে যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করা হতো এবং দৈনন্দিন কাজেও যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হতো সেগুলো সবই সযত্নে রক্ষিত আছে এখানে বড় বড় কাচের শো কেসে। জার ও তাঁর সৈন্য সামন্তের রকমারী অস্ত্র রয়েছে এখানে। পিটার-দা-গ্রেট নিজে যে অস্ত্রগুলো ব্যবহার করতেন সেগুলোও স্থান পেয়েছে এখানে। এছাড়া তাতার বীরদেরও নানা ধরণের বন্দুক, ছোরা, বল্লম সবই স্থান পেয়েছে এখানে। অনেক গুলো ছোরা ও তলোয়ারের খাপে হীরা, মুক্তা পান্না জড়ানো। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে ওগুলো জারদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, তাই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করে আপন কৌলিন্যের কথা ঘোষণা করছে। এর মধ্যে কতকগুলো অস্ত্র আবার পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকেও আনীত হয়েছিল জারদের ব্যবহারের জন্য।

বহু দেশ থেকে সংগৃহীত হাজারো রকমের অস্ত্র ও শিল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে এই যাদুঘরটি।

অস্ত্রাগারের পাশেই আছে নানা রকমের যুদ্ধের বাজনা, আছে বর্ম। মানুষের ব্যবহৃত বর্ম তো আছেই সেই সঙ্গে ঘোড়ার ব্যবহারের বর্মও রয়েছে অনেক।

পাশের ঘরে রক্ষিত আছে প্রাচীন কালের বাসন কোশন। সোনা রূপার নানা রকম বাসন পত্র তো আছেই এছাড়া মৃৎশিল্প, তামা, পেতল, কাঁসা ও লোহার জিনিষপত্রও আছে। এক একটা সোনার থালাও চামচের ওজন কি পরিমাণ? অবাক হতে হয়। হাতীর দাঁতের

নস্যির কৌটা—কী অপূর্ব কারুশিল্প তার। নানাধরণের অদ্ভুত আকারের ছোট বড় বহু ঘড়িও স্থান লাভ করেছে এখানে। এছাড়া দৈনন্দিন জীবন যাপনের টুকিটাকি জিনিসপত্রও অনেক। বলাবাহুল্য অধিকাংশ জিনিসপত্রই সোনারূপার এবং সেগুলো সবই হীরামুক্তা, নীলা ও পান্না প্রভৃতি নানারকম মূল্যবান পাথরে মোড়া। বড় বড় বাই-বেলের খাপ, তার পুরোটাই সোনার—ওজন পনেরো থেকে বিশ সেরের কম নয়। এই ধরণের বাইবেলের খাপ একটা দুটো নয়, অসংখ্য পরিমাণে আছে। বিরাট আকারের ছবির ফ্রেমও আছে অনেক। জার-জারিনা এবং তাঁদের অমাত্যবর্গের এবং গীর্জার পুরোহিতদের ভারি ভারি পোষাক আছে বহু। দামী ভেলভেট ও সিল্কের তৈরী পোষাক, তার সর্বাঙ্গে জড়ি ও মুক্তার কাজ। মাঝে মাঝে আবার দু'চারটে বড় বড় হীরাও দৃষ্টিগোচর হয়। এক একটা পোষাকের ওজন পচিশ-ত্রিশ সেরের কম নয়। এই সব পোষাক দেখে সন্দেহ জাগে, সেকালের জার-জারিনা এবং তাঁদের অমাত্যবর্গ মানুষ ছিলেন না কি ছিলেন দৈত্য-দানব। এতো ভারী ভারী পোষাক কি মানুষে পরতে পারে? পাখীর পালকের তৈরী বাদশাহী পোষাকও আছে। জারিনার ও তাঁর কন্যাদের পোষাকও সাজানো রয়েছে। এইসব পোষাকের কোমর খুব সরু। আজকের দিনের রুশদেশের মহিলাদের দেখে ধারণাই করা যাবেনা যে প্রাচীনকালে এদেরই পূর্বপুরুষদের কোমর অতো অস্বাভাবিক রকমের সরু ও তাদের দেহবল্লবী অতো ক্ষীণ ছিল।

পোষাকগুলোর পাশেই আছে মাথার মুকুট। বিরাট আকারের মুকুট তাতে অগুনতি হীরা মুক্তা বসানো। এর মধ্যে একটী টায়রা নাকি তুরস্কের বাদশাহ জারের ঘোড়াকে উপহার দিয়েছিলেন। এই টায়রাতে মোট ১৭০০ হীরা বসানো আছে। সেকালের ঘোড়ার সৌভাগ্যে একালের মানুষ ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারে না। সর্বত্রই এ ধরণের ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি।

Scanned with CamScanner

পিটার-দা-গ্রেটের সোনার সিংহাসনটাও দেখলাম। তার পাশেই পিটারের পিতার হাতীদাঁতের সিংহাসনটাও আছে। এই সিংহাসনটার কারুকার্য অপূর্ব। ফ্রান্সের অধিনায়ক নেপোলিয়ন জারকে যে চীনামাটীর বাসনপত্র উপহার দিয়েছিলেন সেসবও সযত্নে রক্ষিত আছে।

সব শেষের ঘরে আছে গাড়ী। প্রাচীনকালের রাজা রাজড়ারা যে সব গাড়ী ব্যবহার করতেন সেগুলো সবই স্থান পেয়েছে এখানে। একটা দুটো নয়, প্রায় ২০টা গাড়ী আছে এখানে। এরমধ্যে কোন কোন গাড়ী আছে যাকে টানতো বাইশটি ঘোড়া। বিরাট বিরাট রাজগাড়ী, যাকে বলা হয় chariot. অধিকাংশ গাড়ীই আগাগোড়া সোনায় মোড়া। শীতের দিনে বরফের উপর চালানো শ্লেজগাড়ী আছে। নানা আকারের অসংখ্য গাড়ী আছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার—তাই হীরা-মুক্তা আর পান্না প্রভৃতি নানারকম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি যার আভায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এই যাদুঘরটিতে এতো ঐশ্বর্যের সমাবেশ রয়েছে বলে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ এখানে। এক সঙ্গে বেশী লোক ঢুকতে দেওয়া হয় না। একদল দেখে বের হয়ে যাবার পর আরেক দল সেখানে প্রবেশের অনুমতি পায়।

এতো অপূর্ব ও অদৃষ্টপূর্ব জিনিসের ছড়াছড়ি এখানে যে, দেখতে দেখতে হাঁপ ধরে যায়, পা ধরে আসে। ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম। আবার রাত্রে আসতে হবে এই ক্রেমলীনে এক বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে।

সকালবেলা এত ঘুরে ঘুরে দেখলাম ক্রেমলীনকে কিন্তু ওরই মধ্যে যে সুন্দর সাজানো গোছানো একটা হল কামরা আছে, তাতে ষ্টেজ আছে, কৈ তাতো নজরে পড়েনি সকালে। দেখবোই বা কি করে, তখনতো এই ঘরের দরজায় তালা ঝুলছিল।

আমাদের গাড়ীটা ক্রেমলীনের দোর গোড়ায় পৌঁছাতেই দরজায় পাহারারত শাস্ত্রী ভিতরে ঢুকতে বাধা দিল। গাড়ীর নম্বর টুকে কাকে যেন ফোন করলো তারপরে ভিতরে ঢুকবার অনুমতি পেলাম।

আজ এখানে বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। সারা সোভিয়েট ইউ-নিয়নের সেরা শিল্পীদের নিয়ে একটা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পীর গান খুবই ভাল লাগলো। ভাষা না বুঝলেও সুরের মূর্ছনায় যে মুগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। দর্শকদের অনুরোধক্রমে বহু শিল্পীকেই দু'তিনবার করে গান গাইতে হোল। জর্জিয়াবাসীদের নাচও ভাল লাগলো। এই নাচের সঙ্গে আমাদের দেশের নাচের খুব মিল আছে। অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই আমাদের চলে আসতে হলো। রাত্রে ট্রেনযোগে রওয়ানা হতে হবে লেলিনগ্রাডের উদ্দেশে। আমাদের ট্রেন ছাড়বে এগারোটায়, তাই সাড়ে নয়টায় আমরা ফিরে এলাম হোটেলে। এগারোটার একটু আগেই আমরা ষ্টেশনে পৌছলাম। এবার আমার লেলিনগ্রাড ভ্রমণের সাথী হচ্ছে রোজা বাইমুরাতওরা। ইনিও 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার ইংরেজী বিভাগের একজন সহকারী সম্পাদিকা।

যে ট্রেনযোগে আমরা রওয়ানা হলাম সেই ট্রেনটির নাম রেড-ষ্টার। আমাদের দেশে যেমন সবুজের মাতামাতি ওদেশে তেমনি লালের দৌরাত্ম্য। সবুজ রংটা সতেজ জীবনের প্রতীক্—এতে স্নিগ্ধভাব আছে, যার ভিতর দিয়ে গোটা জাতির চরিত্র স্বচ্ছ কাঁচের মতই ধরা পড়ে। ওদের ঐ লাল রংয়ের মধ্যে একটা উগ্র বিদ্রোহী ভাব আছে। বড় বেশী কঠোরতার প্রকাশ রয়েছে লালের মধ্যে। 'ষ্টার' অর্থাৎ তারার প্রতি লোভ আছে দু'টী দেশেরই। এখানে ওদের সঙ্গে আমাদের মিল। আমাদের দেশে তারা স্থান পেয়েছে জাতীয় পতাকায়, অত্যন্ত সম্মান করি ঐ তারাকে। ওরাও তারার ভক্ত, কিন্তু ওদের তারকার রং লাল। ওদেশে লাল তারা স্থান পেয়েছে বড় বড়

Scanned with CamScanner

অট্টালিকার মাথায়, দোকানের ছাদে। প্রায় প্রত্যেক রাস্তাতেই লাল তারার দেখা পাওয়া যায়।

রেড ষ্টার ট্রেনটির একটি কামরা আমাদের জন্য রিজার্ভ করা হয়েছিল। এই ট্রেনটিতে ছোট ছোট কামরা আছে। কামরা-গুলোর দু'ধারে দুটো পরিষ্কার বিছানা পাতা। বিছানার উপর নরম কম্বল ভাঁজ করা আছে, মাঝখানে জিনিষপত্র রাখবার জন্য একটা চৌকা টেবিল, উপরে একধারে রেডিও ও সেই সঙ্গে মাইক লাগানো। এই মাইকে সারাক্ষণ ঘোষণা করে জানানো হচ্ছে আর কতক্ষণ পর ট্রেনটি ছাড়বে এবং পরবর্তী ষ্টেশনে কখন পৌছাবে। ঘোষণা শেষ করে রেডিওতে গান ও বাজনা শোনানো হচ্ছে। দেয়ালের একপাশে কোট রাখবার জন্য দেয়াল আলমারী আছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা আরামদায়ক ব্যবস্থা। গোটা ট্রেনটায় এই একই ব্যবস্থা। ট্রেনের কোন প্রথম শ্রেণী বা তৃতীয় শ্রেণী নেই। প্রত্যেকটা কামরার পাশদিয়ে লম্বা করিডোর, এবং কয়েকটা কামরার পর পর একটা করে বাথরুম। এই বাথরুমের ব্যবস্থাটা ঠিক আমার মনঃপুত হলো না। সকালে লেলিনগ্রাডে পৌছানোর পূর্বে বাথরুমের সম্মুখে লম্বা কিউ দেখে অসুবিধাটা আরও বেশী করে উপলব্ধি করলাম। লম্বা করিডোরের একপাশে গ্যাসের ষ্টোভে চায়ের পানি ফুটছে—ইচ্ছে করলেই চা খেতে পারেন। ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের পরিচারিকারা খাবার ট্রে হাতে প্রত্যেকটা কামরায় ঘুরে ঘুরে যাত্রীর ইচ্ছানুযায়ী খাবার পরিবেশন করে। পাউরুটী, পনির, মাখন, রুটী, বিস্কুট, টফি ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার যেটা খুশী খেতে পারেন। আমরা হোটেল থেকে খেয়েই এসেছিলাম, তবুও ষ্টেশনে খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল, তাই এক গ্লাস করে চা খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রিবেলা যাচ্ছি। শহর, গ্রাম বা বন্দর রাত্রের অন্ধকারে কিছুই ভাল করে দেখবার উপায় নেই। তাছাড়া সারাদিন ক্রেমলীনে

হেঁটে হেঁটে শরীরটাও খানিকটা আরাম করবার জন্য করুণ মিনতি জানাচ্ছিল। ট্রেনটা ছাড়তেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। গাড়ীর ভিতরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ধীরে ধীরে ঘুম নেমে এলো চোখে। মাথার উপরে তখনও মিষ্টি মধুর গান বেজে চলেছে রেডিওতে।

বিছানায় আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কাজেই রাত্রে কোথায় কোথায় ট্রেন থেমেছে সে সব কিছুই বলতে পারবোনা। ভোর ছ'টায় ঘুম ভাঙলো। তখন শুনতে পেলাম মাইক সজোরে ঘোষণা করছে যে আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা লেলিনগ্রাড পৌছাবো। অর্থাৎ তোমরা সবাই ওঠো, তৈরী হয়ে নাও, গন্তব্যস্থল এসে গেল প্রায়।

তাড়াতাড়ি উঠে একটু মুখহাত ধুয়ে তৈরী হবার উদ্দেশ্যে বাথরুমের দিকে যেতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আমার আগে আরও পাঁচজন সেখানে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছে। আধঘণ্টার মধ্যে বাথরুম খালি পাবার কোন আশা নেই দেখে ফিরে এলাম নিজের কামরায়। পরিচারিকা এসে জানতে চাইলো আমরা চা খাব কিনা। আমার সঙ্গিনী রোজা চা ও বিস্কুট আনতে হুকুম করলো। ইতিমধ্যে একজন পরিচারিকা এসে আমাকে জানিয়ে গেল যে অন্য একটি বাথরুম খালি আছে, ইচ্ছা করলে আমি সেটা ব্যবহার করতে পারি।

লেলিনগ্রাড ষ্টেশনে ট্রেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের তোড়া হাতে একজন মহিলা ট্রেনের কামরায় উঠে এলেন। রোজা পরিচয় করিয়ে দিল, জিনাইদা নিকোলাইভ্না। ইনি এখানকার ডাইরেক্টার অফ স্কুলস্। ট্রেন থেকে নামতেই আরও সাত-আট জন মহিলা ফুলের মালা ও তোড়া দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি যে আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে পোল্যাণ্ড থেকে পাঁচজন মহিলার একটি প্রতিনিধিদলও এসেছে।

Scanned with CamScanner

একে একে এদেরও মাল্যভূষিত করা হোল। এইবার সদলবলে রওয়ানা হলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে।

এখানকার সবচেয়ে নামকরা হোটেল আস্তরিয়াতে আমাদের সকলকে এনে তোলা হোল। এই সেই স্বনামধন্য হোটেল যার ম্যানেজারকে চিঠি লিখেছিলেন স্বয়ং হিট্‌লার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীর অধিনায়ক ম্যানেজারকে লিখে জানিয়েছিলেন যে বড়দিনের উৎসবটা তাঁর হোটেলে উদযাপনের ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে। পাঁচশো জনের সকল প্রকার খাবার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা যেন সম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু হিট্‌লারের কোথায় যেন একটু হিসাবে গোলমাল হয়েছিল যার ফলে তার আর লেলিনগ্রাডে পৌঁছানো হোলনা। বহু দিন ধরে গোটা শহরটাকে পৃথিবীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘিরে থাকবার পরও শহরে প্রবেশ করতে পারলোনা জার্মান সৈন্যদল। নয় শ দিন পার হবার পর হার স্বীকার করতে হলো হিটলারকে লেলিনগ্রাডবাসীদের স্বদেশ-প্রীতির নিকটে। ফিরে যেতে বাধ্য হোল জার্মান সৈন্যদল। কিন্তু এদিকে শহরের অবস্থা তখন জরাজীর্ণ। সমগ্র পৃথিবীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে খাদ্যদ্রব্যের দারুণ অভাব দেখা দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। দারুণ শীতে ও খাদ্যের অভাবে তিন-চতুর্থাংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই দারুণ দুর্যোগময় দিনগুলোর কথা কখনো ভুলতে পারবে না এখানকার লোকজন। সেই দিনের কথা স্মরণ আছে বলেই তারা যুদ্ধের দারুণ বিভীষিকাকে ভয় করে। তাই তারা শান্তি চায়—শুধুই শান্তি। রুশভাষায় 'মীর' বলে শান্তিকে।

কোন্‌ কথা থেকে কোথায় চলে এসেছি দেখুন। আমাদের হোটেলের সম্মুখেই একটা সুন্দর পার্ক আছে। এই পার্কের মাঝখানে সম্রাট নিকোলাসের মূর্তি সযত্নে রক্ষিত আছে। ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে আছেন সম্রাট নিকোলাস। ঘোড়াটা পিছনের দু'

পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার এই অদ্ভুত ভঙ্গিটাই মূর্তিটাকে অপূর্ব করে তুলেছে। এই পার্কের চারপাশ দিয়ে বড় বড় রাস্তা চলে গিয়েছে শহরের বিভিন্ন দিকে। ডাইনে সেন্ট আইজ্যাকের নামে উৎসর্গীকৃত আইজ্যাক ক্যাথিড্রেল। জার-জারিনা এবং সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকদের বিধাতাকে স্মরণ করবার ভজনালয়রূপে ব্যবহৃত হতো এই ক্যাথিড্রেল। এই ক্যাথিড্রেলের চূড়াটা সোনায় মোড়া, তাই বহু দূর থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওই চূড়ায় দাঁড়ালে গোটা শহরটাই দৃষ্টিপথে পড়ে। দূরে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের বুকে ভ্রমণরত স্টীমার লঞ্চও এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। ক্যাথিড্রেলের ভিতরটায় দামী পাথর বসানো আশ্চর্য রকমের কারুকার্য। বহু প্রাচীন ধর্মীয় চিত্রও রক্ষিত আছে। বর্তমানে এই ক্যাথিড্রেলটাকেও যাদু ঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ক্যাথিড্রেলের উল্টোদিকে ডিসেমব্রিষ্ট স্কোয়ার। ১৮২৫ সালে প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল। এই বিদ্রোহকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল তদানীন্তন সরকার গোষ্ঠী। তাই মনের খুশীতে স্কোয়ারটির নামকরণ করা হোল ডিসেমব্রিষ্ট। বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে এই স্কোয়ারটিতে জারদের মূর্তি রক্ষিত ছিল। বিপ্লবের সময় উন্মত্ত জনতা সমস্ত মূর্তি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে এর মধ্যে পিটার-দা-গ্রেটের মূর্তিটা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে, ওটাকে স্পর্শ করেনি কেউ। পিটারের তেজোদীপ্ত মূর্তিটা অপূর্ব। ঘোড়ার পিঠে পিটার আর পদতলে তাঁর দীর্ঘ সাপ। শত্রুকুলকে যে দমন করেছেন তিনি তারই ইঙ্গিত রয়েছে মূর্তিতে। পিটার ছিলেন সবারই প্রিয় তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মূর্তিটাকে সযত্নে ঢেকে রাখা হয়েছিল বোমার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। বোমায় বোমায় গোটা লেলিনগ্রাড শহরটাই তছনছ্‌ হয়ে গিয়েছিল। দেশের সকল পুরুষ ও সকল তরুণকে প্রাণদান করতে হয়েছিল দেশরক্ষা কল্পে। এদের প্রাণদানের পর

Scanned with CamScanner

এদের স্থান দখল করেছিল নারীরা ও কিশোররা। তাই পথে ঘাটে দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী।

গোটা লেলিনগ্রাড শহরটাকেই সহস্র পাঁকে জড়িয়ে রেখেছে নেভা নদী। এই নদী এঁকে বেঁকে গিয়ে আলাপ জমিয়েছে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে। নেপোলিয়নের আক্রমণে যখন মস্কো শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল সেই সময় পিটার দেশের রাজধানী সরিয়ে এনেছিলেন এখানে। পিটারের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাই এ শহরের নামকরণ করা হয়েছিল পিটারস্‌বার্গ। সেই পিটারসবার্গ ই আধুনিক রূপসজ্জা গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম গ্রহণ করলো 'লেলিনগ্রাড'। শহরটাকে ঘিরে ছোট ছোট বহু খাল আছে। আর এই খালগুলোর পারে আছে অসংখ্য পাথরের অট্টালিকা। হুকুমজারি করা হয়েছিল যে পিটার্সবার্গ ছাড়া আর কোথায়ও কেউ পাথরের অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারবে না। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খালগুলোর অস্তিত্ব ঢেকে রাখা গেলনা—তিনশো ষাট্‌টা পুল তৈরীকরার পরও ঐ প্রচেষ্টা সফলকাম হোলনা। দু'পা না হাঁটতেই একবার করে পুল পার হতে হচ্ছে—কাজেই স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে পরিব্রাজকের মনের কোণে।

হোটেলে আমার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে উপলব্ধি করছিলাম, উপভোগ করছিলাম, হঠাৎ বেরসিকের মত শব্দ করে টেলিফোনটা বেজে উঠ্‌লো। রোজা বাইমুরাতরা ফোনে জানালো, সে নিচে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। প্রাতঃরাশ খেতে যেতে হবে খাবার ঘরে।

খাবার ঘর খুব বড় এবং সুন্দর করে সাজানো। অনেকগুলো সুন্দর মর্মরমূর্তি রাখা আছে ঘরের বিভিন্নস্থানে। ঘরের মাঝে মাঝারি সাইজের অসংখ্য টেবিল আর প্রত্যেকটি টেবিলে বিভিন্ন দেশের পতাকা বসানো আছে। ওরই মধ্যে একটা টেবিলে পাকিস্তানের পতাকাও রয়েছে দেখতে পেলাম অর্থাৎ ঐ টেবিলটা আমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

নিজেদের জাতীয় পতাকা নজরে পরতেই মনটা আনন্দে নেচে উঠ্‌লো। এতদিন বুঝতে না পারলেও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম বিদেশের কোথায়ও নিজেদের জাতীয় পতাকা দেখতে পেলে কতখানি আনন্দ জাগে মনে। নিজের অজ্ঞাতেই একটু গর্ব অনুভব করলাম। দেখ—তাকিয়ে দেখ আমার জাতীয় পতাকা কত সুন্দর, সতেজ ও পবিত্র। কোন জাঁকজমক নেই, নেই রংচংয়ের বাহার—আছে স্নিগ্ধতা, আছে সজীবতা আর ওরই মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে পবিত্র ভাব। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখি নানাদেশের নানাধরণের লোকে ঘরটা ভর্তি অথচ কোন হৈ চৈ নেই। এই হোটেলে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই অধিবাসী আছে। তাই খাবার ঘরের টেবিলেও বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা শোভা বর্ধন করেছে। একটু দূরে পোল্যাণ্ডের সেই মহিলা প্রতিনিধি দলও বসে আছেন। এত দেশের পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হয়েছে এখানে অথচ কেউ কারও ভাষা জানেনা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে শাড়ী পরিহিতা মহিলা একমাত্র আমিই ছিলাম, তাই ঘরে প্রবেশ করবার পর থেকেই যে সকলে আমাকে লক্ষ্য করেছে সেটা বেশ টের পাচ্ছিলাম। আমার কৃষ্ণবর্ণ যে তাদের লক্ষনীয় নয় সেটা বেশ বোঝা গেল। কারণ আমার চেয়ে অন্তত দশগুণ কালো কয়েকজন আফ্রিকান পুরুষ ও মহিলা ঘরের এককোণে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল, কিন্তু তাদের দিকে কারও লক্ষ্য ছিলনা। সুতরাং ওদের দ্রষ্টব্য যে আমি নই আসলে আমার শাড়ীটাই, তা বুঝতে একটুও দেরী হোলনা। অথচ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কোন শাড়ী আমার পরণে ছিলনা—নেহাৎই সাদা শাড়ী। আসল কথা হোল শাড়ীটা ওদেশে এখনও নূতন তাই এত কৌতূহল সকলের।

দু'টো গাড়ী করে আমি ও পোল্যাণ্ডের মহিলারা একসঙ্গেই শহর প্রদক্ষিণে বের হলাম। প্রথমেই নেভার কূলে ভিড়ানো অরোরা ক্রুজার দেখতে গেলাম। ১৯০৩ সালে জাহাজটি তৈরী

Scanned with CamScanner

হয়। আকারে ছোট হলেও ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় খাটতে হয়েছিল একে খুব। ছোট বলে খাটুনির হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাই কিছুটা সম্মান একে দেওয়া হয়েছিল। এই সম্মান চারগুণ বাড়লো ১৯১৭ সালে। এই সময়ে যখন দেশময় বিদ্রোহ দেখা দিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে এই অরোরা ক্রুজার থেকে গোলা ছোঁড়া হয়েছিল জারের উইন্টার প্যালেসের উদ্দেশ্যে। শুধু এইখানেই শেষ নয়—বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা সার্থক হবার পর এই ক্রুজার থেকেই সগৌরবে সে সংবাদ পরিবেশন করে জানিয়ে দিয়েছিল সকলকে। অথচ আজ এর দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই যে শান্ত শিষ্ট গোবেচারার মত জুলজুলে দৃষ্টিতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পথচারীদের বিস্মিত দৃষ্টিকে যে উপভোগ করছে, একদিন সেই ছিল উৎসাহে দীপ্ত, তারুণ্যে ও সজীবতায় পরিপূর্ণ বিপ্লবীদের সহকর্মী। শীতের প্রকোপ থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য তার সমস্ত দেহটাই মোটা কাপড়ে ঢাকা। শুধু নাকটা বের করে বসে আছে। মাঝে মাঝে স্কুলের ছেলেমেয়েরা আসে, তাকে লক্ষ্য করে, কলকব্জাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্পর্শ লাভ করে যেন কোন পবিত্রস্থান দর্শন করছে, ভাবটা এমনি। সেকালের বিপ্লবযুগের নেতাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়ে 'অরোরা ক্রুজার' সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন দখল করে বসে আছে।

অরোরা ক্রুজারকে আর একবার শেষবারের মত দর্শন করে এগিয়ে চললাম। খানিকটা এগোতেই নজরে পড়লো Temple of Blood. জার প্রথম নিকোলাসকে এইস্থানে হত্যা করা হয়েছিল। সে রক্তচিহ্নিত স্থানেই এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে, তাই এ অদ্ভুত নামকরণ। পিটার-দা-গ্রেটের গ্রীষ্ম প্রাসাদ পরিদর্শন করলাম। পরিবেশটি ভারী মনোরম। চারদিকে অজস্র গাছপালা, পিছনে নেভানদী। এই স্নিগ্ধ-শ্যামল পরিবেশে টালির ছাওয়া ছবির মত সুন্দর বাড়িটা। দেখে মনে হয় চিরশান্তি এখানে বিরাজ করছে। এরপর নেভেস্কী

স্কোয়ার (Avenue Nevski) মস্কো এ্যাভেনু (Avenue-de-Moscow) লেনিন স্কোয়ার, ফিনল্যাণ্ড টারমিনাসের যেখানে লেনিনের মূর্তি হাত তুলে জাতিকে নির্দেশ দিচ্ছে সব দর্শন শেষ করে, সেণ্ট আইজ্যাক ষ্ট্রীট ও প্যালেস স্কোয়ার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এলাম পৃথিবী বিখ্যাত 'স্মলনীতে'। আইজাক ষ্ট্রীটের আইজাকে ক্যাথিড্রেল ও প্যালেস স্কোয়ারের মাঝখানে অবস্থিত এই স্মলনী (smallney)। এক সময়ে এই স্মলনী বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। এরই একটা ঘরে লেলিন বাস করতেন সস্ত্রীক। আজ এখানে নানারকম অফিস স্থাপন করা হয়েছে। তবে লেলিন যে অংশে থাকতেন, সেই অংশে লেলিনের ব্যবহৃত জিনিষপত্র এবং তাঁকে কেন্দ্রকরে নানা ঘটনার ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাত্র দু'টো ঘর তাও আবার আকারে খুবই ছোট। একটা ঘরকেই কাঠের পার্টিশন দিয়ে দু'টো বানানো হয়েছে, একটা বসবার ঘর আর একটা শোবার ঘর। ভাবতেও কিরকম আশ্চর্য লাগে যে এতবড় প্রাসাদের মত বাড়ীর মাত্র একটা কামরা নিজস্ব ব্যবহারের জন্য রেখেছিলেন অতবড় নেতা। তিনি ইচ্ছা করলেই গোটা প্রাসাদটাকেই নিজের আরাম গৃহ বানাতে পারতেন। অথচ নিজের আরামের কথা ভোগের কথা তিনি যে কখনও কল্পনাও করেননি, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ঘর দুটোর জিনিষপত্র দেখলেই। বসবার ঘরে একপাশে একটা কাঠের টেবিল আর তার সঙ্গে একটা নড়বড়ে চেয়ার। টেবিলের উপরে লোহার দোয়াতদানী, একটা অত্যন্ত সাধারণ টেবিল ল্যাম্প আর লেলিনের ব্যবহৃত কিছু কাগজ সাজানো আছে। এরই একপাশে পুরানো মান্ধাতার আমলের টেলিফোনও রক্ষিত আছে। এই টেলিফোনের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ রাখতেন কর্মীদের সঙ্গে এবং প্রয়োজন বোধে আদেশ ও নির্দেশ দিতেন। এই ঘরের আর এক-কোণে একটা গোল টেবিল ও তার তিনদিকে তিনটি চেয়ার

Scanned with CamScanner

সাদা কাপড়ে ঢাকা রয়েছে। আমরা সচরাচর লেনিনের যে ছবি দেখি তাতে এই টেবিলের পাশে এই চেয়ারেই তাঁকে উপবিষ্ট দেখা যায়। এই ঘরের পাশেই একটা ঢাকা দেওয়া করিডোর আছে। এখানে দেয়ালের ছু'পাশে লেনিনের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি এবং বিপ্লবের সময়ে যে সকল ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেই সব স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে লেনিনের স্বহস্ত নির্মিত বহু আদেশনামা সাজানো আছে। এছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম যে ঘোষণাপত্র তৈরী করা হয় সেটাও স্থান পেয়েছে এখানে। গোটা দেশটাতে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হোল, যার ফলে একদিন আগুন জ্বললো দাউ-দাউ করে। সেই স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ স্পার্ক (spark) পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কাচের শো কেসে রক্ষিত আছে। এই স্পার্ক মজলুম জনগণের দাবীকে তুলে ধরেছিল, হাজার হাজার বুভুক্ষু জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য দাবী জানিয়েছিল। তাই জ্বালা ধরেছিল জারের হৃদয়ে। কিন্তু জারের জ্বালার কোন প্রতিকার হোলনা বরং তার সেই ক্রোধের আগুনকে হার মানতে হয়েছিল স্পার্কের কাছে। এই স্পার্কের ফুলকি আগুনের তাপে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল জারতন্ত্র।

শোবার ঘরে দেয়ালের একপাশে আছে লেনিনের পত্নীর ছবি। ছোটঘর—তারই ছু'পাশে অত্যন্ত সাধারণ ছুটো লোহার খাট আছে, মাঝখানে ছোট টেবিল, তার উপর একটা টেবিল ল্যাম্প। এই হোল তাঁদের শোবার ঘর—ঘর না বলে কুঠরী বলাই ভাল কারণ অত্যন্ত ছোট এবং অন্ধকার ঘরটি। ছুখানা শোবার খাট আর একটা টেবিল—এই হোল অত বড় দেশবরেণ্য নেতার গৃহসজ্জা।

এই ঘর থেকে বেরিয়ে একটা বড় হল ঘরে এলাম। এটা সেই ঘর যে ঘরে সংগ্রামে জয়লাভ করে বিপ্লবীরা প্রথম সভা করেছিল। ঘরটা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে খুবই বড়। মাঝে মাঝে গোলাকার স্তম্ভ উঠে গিয়েছে উপরে ছাদের দিকে। সম্মুখে বিরাট বক্তৃতামঞ্চ। মঞ্চের

উপরে একটা বিরাট কাঠের ষ্ট্যাণ্ড মত আছে, বিজয়লাভের পর ওখানেই দাঁড়িয়ে লেনিন প্রথম বক্তৃতা করেন দেশবাসীর উদ্দেশে। ঘরটায় এখন রাজমিস্ত্রী কাজ করছে, তাদের জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো—তাই সাধারণের জন্য আপাততঃ এর দরজা বন্ধ রাখা হয়েছে।

তাইসিয়া ইভানোভনা সুতোভা সেক্রেটারী অব্ রিজিওনাল কাউন্সিল অব্ লেলিনগ্রাড (Secretary of Regional Council of Lelingrad) এখানেই বসেন, এই বিরাট অট্টালিকার একটি ঘরে তাঁর অফিস। তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই িনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, চা পানে আপ্যায়িত করলেন। নানারকম গল্পগুজব করে ঘণ্টাখানেক পর বিদায় নেবার সময় ভদ্রমহিলা আমাদের সকলের কোটে একটা করে লেলিনের মুখ আঁকা পিন লাগিয়ে দিলেন আর উপহার দিলেন একটা করে সিল্কের স্কার্ফ। এই স্কার্ফে লেলিন-গ্রাডের মোটামুটি ইতিহাস অঙ্কিত আছে। এখানকার নামকরা বিখ্যাত অট্টালিকাগুলি অঙ্কিত আছে এতে।

হোটেলে যখন ফিরে এলাম তখন তিনটা বাজে। পাঁচটায় আবার প্রোগ্রাম আছে, সুতরাং হাতে মাত্র ছু'ঘণ্টা সময়। রোজা ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলো ক্লান্তি লাগছে কিনা। না, মোটেই না। আমি এসেছি নূতন দেশ দেখতে, বিশ্রাম করতে আসিনি। যতটুকু পারা যায় দেখে নিতে চাই। ক্লান্তি আসে বইকি—কিন্তু নূতন দেশকে দেখবার ও জানবার এই সুযোগ তো সহজে পাওয়া যাবে না, সুতরাং ক্লান্তিকে তো এখন প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমি দেখতে চাই আরও, জানতে চাই আরও বেশী করে কিসের জোরে তোমরা এত উন্নতিলাভ করলে। কোন্ যাছুমন্ত্রে তোমাদের দেশের চেহারা পাল্টে গেল। সেই যাছুমন্ত্রের চাবিটি কোথায়? কেমন? জানতে চাই। কিসের জন্য এতকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য দেশবাসী তোমাদের দেশের ছুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছিল। কিসের তোমাদের

Scanned with CamScanner

এত গৌরব, এত গর্ব? হ্যাঁ—গর্ব করবার মত বস্তু আছে, তোমাদের দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে উত্থান-পতনের ইতিহাস। এই উত্থান পতনের ইতিহাস সব দেশ সব জাতিরই আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য আছে অনেক। তোমরা গরীবকে দিয়েছো সম্মান, দিয়েছো নিরাপত্তা। তাই পৃথিবীর নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের তীর্থস্থান এই লেলিনগ্রাড। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে নাও লেলিনগ্রাডকে। কিন্তু ভাল করে কি দেখবার উপায় আছে? বাইরে তো সারাক্ষণই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কন্‌কনে শীত। ঘরের বাইরে পা-দেওয়া মাত্রই মনে হয় কন্‌কনে শীতের স্পর্শে হাড় কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

পাঁচটায় পৌঁছলাম ম্যাটারনিটী হাসপাতালে। বিরাট হাসপাতাল, তাতে নানারোগের বিভাগ আছে। নামে ম্যাটারনিটী হলেও, এতে নানারকম স্ত্রীরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। একটা বড় ঘরে সুন্দর সুন্দর ফুলগাছের বড় বড় টব্ বসিয়ে সুন্দর বাগান রচনা করা। মনের প্রফুল্লতা বজায় রাখবার জন্য রোগিনীরা এখানে বসে পরস্পরের সঙ্গে বিশ্রামালাপ করে।

রাত্রে এখানকার বিখ্যাত ব্যালে নাচ দেখতে গেলাম। কাহিনীটা গড়ে উঠেছে এক তাতারের অপূর্ব প্রেম নিয়ে। ভিন্‌দেশের রাজ-কন্যা যখন আপন প্রেমিকের সঙ্গে আনন্দে ও গল্পে মশগুল সেই সময় তাতার রাজ আক্রমণ করলেন সেই রাজ-প্রাসাদ। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হলেন রাজা ও রাজপরিবারের অন্য সকলে। রাজকন্যার প্রেমিককেও মৃত্যু বরণ করতে হোল যুদ্ধে। বন্দিনী হোল রাজকন্যা। রাজকন্যাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হোল তাতার-রাজকে। তিনি আর তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকান না, রাজকার্যে মন নেই তাঁর, সর্বদাই উদাসীন, আনমনা। স্বামীর এই হঠাৎ করে আনমনা হওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে তাতার-মহিষী আবিষ্কার করলেন রাজকন্যাকে। ভিখারীর মত কাকুতি মিনতি জানালেন তিনি রাজকন্যার নিকটে

তাঁর স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে। রাজকন্যা ভাষা বোঝেননা তাঁর, তাই মর্ম উদ্ধার করতে পারলেন না এই কাকুতি মিনতি আর আবেদনের। তাতার-মহিষী ভুল বুঝলেন রাজকন্যাকে। তাঁর ক্রোধে ইন্ধন জোগালো তাতার-রাজের টুপি। তাতার-রাজ রাজকন্যাকে প্রেম-নিবেদন করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার সময় তার অলক্ষ্যে কখন টুপিটা মাথা থেকে খসে পড়েছে। কুপিতা মহিষী রোষবশে ছোরা বসিয়ে দিলেন রাজকন্যার বুকে। রাজকন্যার প্রহরারত রক্ষিণী ছুটে খবর দিল তাতার-রাজকে। উন্মাদের মত ছুটে এলেন তিনি কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। চরম শাস্তি দেওয়া হোল রাজ-মহিষীকে। পর্বতের উপর থেকে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোল অতল গহ্বরে। রাজকন্যার সমাধির উপর স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করে সেখানেই সময় কাটাতে লাগলেন তাতার রাজ। রাজ-সিংহাসন শূন্য পড়ে রইলো। কাহিনী এখানেই শেষ কিন্তু কি অদ্ভুত নৃত্যনৈপুণ্য। রুশদেশের ব্যালে চিরবিখ্যাত। তাদের সুক্ষ্ম নৃত্য-কৌশল সত্যিই অপূর্ব অভূতপূর্ব। আর এর সৌন্দর্য দশগুণ বর্ধিত করেছে ষ্টেজের সাজ-সজ্জা ও দৃশ্য-সজ্জা। সব কিছুতেই তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় ছড়ানো আছে।

বদ্-অভ্যাসই বলুন আর সু-অভ্যাসই বলুন আমার চিরকালই ঘুম ভাঙ্গে খুব ভোরে। বিদেশে এসেও এই অভ্যাসটার হাত এড়াতে পারলামনা। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি দুপুর রাত, গোটা শহর সুপ্তির কোলে। শীতের রাত, বড়ই নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ। এখন কি করা যায়? আরেকবার ঘুম দেবো, কিন্তু ঘুমতো এখন আর আসবেনা। একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে লাগলাম। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকখানা বই জমেছে। যেখানেই যাচ্ছি দু'চারখানা করে বই উপহার পাচ্ছি। এরমধ্যে অধিকাংশই রুশভাষায় হলেও দু' চারখানা ইংরেজীও আছে আর এখানকার শিক্ষার উপর লেখা একখানা বাংলা বইও হাতে এসেছে।

Scanned with CamScanner

আধঘন্টা পর পর ঘড়ি দেখছি। আটটা বাজ্‌লো ? নাঃ—আর তো শুয়ে থাকা যায় না। বিছানা ছেড়ে আবার জানলায় এসে দাঁড়ালাম। এখনও নিশুতি রাত, আকাশে আলো জাগ্‌বার কোন আশাও নেই। বৃষ্টি হচ্ছে, সেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। এদেশে পা দিয়ে অবধি সূর্যের চেহারা দেখতে পাইনি। এও এক ভিন্নধরণের সৌন্দর্য। সর্ব্বদাই ম্লান কান্নায় ভেজা আকাশের গাল। মনে পড়ে আমাদের দেশের উজ্জ্বল সূর্যের হাসিমুখ। ভিন্ন পরিবেশে এই দুই দেশের দুই রূপই ভাল। একটা মনকে বিষণ্নকরে তোলে, করুণা জাগায়, আর একটা জাগায় উদ্দীপনা চঞ্চলতা।

সাড়ে নটায় গেলাম এখানকার মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত টুপির কারখানা দেখতে। যদিও টুপির কারখানা বলা হয়, কিন্তু এখানে মহিলাদের কোটও তৈরী হয়। শতাধিক মহিলা কাজ করছেন। বড় হলঘরে একযোগে মেশিন চলছে আর নানারকম আধুনিক ডিজাইনের কোট তৈরী হচ্ছে। শিশুদের কোটও এরা তৈরী করছে। ডিজাইনগুলো সত্যিই খুব সুন্দর। বড় হলঘর ছাড়া আরও কয়েকটা ঘরে নানা বয়সী মেয়েরা কাজ করছে। কেউ কাটছে, কেউ বোতাম লাগাচ্ছে, সবাই কাজে মগ্ন। বাড়ীটা কিন্তু অত্যন্ত পুরানো, পরিবেশটা ভাল লাগলো না। দেয়াল এবং মেঝে সবই চুণওঠা বালিখসা। এর কারণ জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। ডাইরেক্টার ভদ্রমহিলা জানালেন, তাঁরা শিগ্‌গীরই ফ্যাকটরীর নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন।

সবশেষে ডাইরেক্টার ভদ্রমহিলা তাঁর অফিস ঘরে আমাদের এনে বসালেন। এই ঘরটা আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। চা পানে আপ্যায়িত করবার পর আমাদের একটা করে টুপি উপহার দেওয়া হোল। সুন্দর নকল ফারের টুপি, দেখতে সত্যিই সুন্দর। কিন্তু আমি টুপি দিয়ে কি করবো, এ জিনিষ যে আমাদের দেশে অচল। সুভেনীর হিসাবে রেখে দেওয়া ছাড়া আর কোনও কাজে লাগবেনা।

জর্জিয়ার রিপাব্লিকান উইমেন্‌স্ কমিটির চেয়ারম্যান (বামে) ও সেক্রেটারী (সর্বদক্ষিণে)

Scanned with CamScanner

হারমিটেজ পৌছালাম এগারোটায়। নেভার কূলে অবস্থিত এই হারমিটেজ গুহাবলী—ওপারে দেখা যায় পিটার ও পলের দুর্গ। পিটার-দ্য-গ্রেট ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যখন সেন্ট পিটার্সবুর্গ স্থাপন করেন সেই সময় এই দুর্গটি গড়া হয়, এবং এই অঞ্চলে এইটিই প্রথম অট্টালিকা। এরপর থেকে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই দুর্গটি রাজবন্দীদের কারাগার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এরই আরেক পাশে দেখা যায় গির্জার সরু তীক্ষ্ণ চূড়া, যার উচ্চতা ৩৯৪ ফুট। পল ও পিটারের গির্জা। জারদের কবরস্থানও একে বলা চলে, কারণ বেশ কয়েকজন জারকে এখানে সমাহিত করা হয়েছে।

হারমিটেজ হচ্ছে পাঁচটি বড় বড় অট্টালিকার সমন্বয়ে গঠিত রাশিয়ার প্রাচীন জার রসোনোভের শীতকালীন প্রাসাদ—অর্থাৎ উইন্টার প্যালেস। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ১৭৫৫—১৭৬২-তে তৈরী হয়েছে এই প্রাসাদাবলী। পুরানো ধাঁচের তৈরী পাথর কেটে কেটে বড় বড় থাম তৈরী হয়েছে। ছাদের উপর অসংখ্য নারী ও পুরুষের মূর্তি। রুশ দেশের সবচেয়ে বড় যাদুঘর এই হারমিটেজ প্রাসাদ সম্পদ ও শিল্প-সম্ভারে সত্যিই অপূর্ব। অসাধারণ সব শিল্প-সম্ভারে পূর্ণ এর প্রতিটি ঘর। একটা দুটো নয়, অসংখ্য আর অগুণতি ঘর এবং প্রত্যেকটি ঘরই বিস্ময়কর শিল্প-বস্তুতে পরিপুর্ণ। দোতালার ছাদের উপর মাটি ফেলে তাতে বাগান তৈরী করা হয়েছে। নেভানদী থেকে পানি ছিটানো হয় এই গাছগুলোতে। বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে নেভানদীর দিকে তাকালে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পিটারের সোনার তৈরী গাড়ী সযত্নে রাখা আছে এখানে। নানা-যুগের, নানাআকারের এবং নানারকম ধাতুর তৈরী ঘড়ি আছে, বিরাট বিরাট আকার থেকে নিয়ে একেবারে ক্ষুদ্র আংটির আকারের ঘড়িও রয়েছে এখানে। রূপোর গাছে সোনার ফুল ফুটে আছে, আর তার ডালে বসে আছে মণি-মাণিক্যের ময়ুর। ময়ুর গাছের

Scanned with CamScanner

ডালে বসে তার পেখম দোলাচ্ছে। মোটেই রূপকথার গল্প নয়, কল-কব্জার ব্যাপার শুধু। আমার সঙ্গিনী বললো যে গোটা হার-মিটেজ দেখতে গেলে পুরো একমাস সময় লাগবে। সুতরাং যে বিভাগগুলো সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ আমার সেটা বেছে নিয়ে দেখাই ভাল। ওর প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে বললাম, চিত্রবিভাগ এবং প্রাচীন সংস্কৃতি বিভাগটাই আমার দেখবার ইচ্ছা বেশী। তারপর যদি সময় হাতে থাকে তখন আবার অন্য কোন বিভাগ দেখা যাবে।

ছবির সমারোহ। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত চিত্রকরের বিখ্যাত চিত্রগুলোর সমাবেশ ঘটেছে এখানে। লিওনার্ডো-দ্য-ভিঞ্চির মূল ছবি আছে, আছে র‍্যাফায়েলের মূল ছবি যোসেফ মেরী ও তাঁর ছেলে। র‍্যাফায়েলের অঙ্কিত অনেকগুলো ছবিই এখানে সংগৃহীত আছে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূল ছবি, র‍্যামব্রাণ্ড-এর মূল ছবি। মোট-কথা পৃথিবীর বিখ্যাত চিত্রগুলোর অপূর্ব সংগ্রহ আছে এখানে। অধিকাংশ ছবিই বাইবেলের কাহিনীকে অবলম্বন করে অঙ্কিত। অনেক সময় মূল ছবি পাওয়া না গেলে তার নকল যোগাড় করা হয়েছে। রেমব্রাণ্ডের ছবি দিয়েই পুরো একটা ঘর ভর্তি। অনেক-গুলো ছবির আকার অতি বৃহৎ, ঘরের গোটা দেয়াল জুড়েই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে একটা ছবি।

যুদ্ধের সময় অমূল্য এই সম্পদরাজি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মাটির তলায়। গ্যালারির উপরটা কাচে ঢাকা। যুদ্ধের সময় এই কাচের উপর বোমা পড়ে কাচকে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। ছবিগুলো না সরালে যে কি অবস্থা দাঁড়াতো সেকথা ভাবতেই ভয় লাগে। পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ মানুষের জিঘাংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। পৃথিবীর খ্যাত ম্যাডোনা, লাষ্ট সাপার—সবই দেয়ালের গায়ে সহাস্যবদনে ঝুলছে। হারমিটেজ প্রাসাদের একদিকে এই ছবির সমারোহ, মনে হয় এ আর এক পৃথিবী। মুগ্ধ হয়ে দেখি পৃথিবী বিখ্যাত ছবিগুলোকে—পাশে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গিনী রোজা

বাই মুরাতওয়া তাড়া দেয়, এভাবে দেখতে থাকলে যে এক ছবির বিভাগ দেখতেই তোমার সাতদিন লাগবে।

জবাবে বলি, কি করবো বলো? এই মূল ছবিগুলো দ্বিতীয়বার দর্শন করবার সুযোগ জীবনে আর আসবে কিনা জানিনা, তাইতো প্রাণভরে দেখে নিচ্ছি। মনের পটে ভাল করে এঁকে নিচ্ছি যাতে ভুলে না যাই। তাই এত সময় নিয়ে দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি, বিমোহিত হচ্ছি। এখান থেকে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিতে মন চাইছে না।

ছবি দেখার পর্ব সমাধা করে অন্য ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হোল, ওটা আবার কি? রূপোর তৈরী শবাধার, যাকে বলে কফিন। এটা কি মানুষের কফিন না কি কোন দৈত্য-দানবের? না-না, দৈত্য-দানবের নয়, মানুষেরই শবাধার ওটা। কেউ বলেন, মস্তবড় সেনাপতি ছিলেন ঐ লোকটা। আবার অনেকে বলেন, সেনাপতি টতি কিছু ছিলেন না, আসলে সেকালের নামকরা পালোয়ান ছিলেন। তা হতে পারে, পালোয়ানই হবেন। সাধারণ মানুষের কফিন এটা হতে পারে না। তিন হাজার পাউণ্ড লেগেছিল এই কফিন তৈরী করতে। জারের খাস-কামরায় প্রবেশ করলাম। বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে জার এই ঘরে দেখা করতেন। এখন এই ঘরে সমগ্র রুশদেশের একটা মানচিত্র টাঙ্গানো আছে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নানারঙের পয়তাল্লিশ হাজার পাথর জোড়া দিয়ে এই মানচিত্রটি তৈরী হয়েছে।

চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। ধাঁধাঁ লাগবে-নাইবা কেন? শুধুমাত্র মণিমুক্তা দিয়েই একটা ঘর ভর্তি। পুরানো কবর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে বহু গহনা ও মণিমুক্তা। এগুলো প্রায় তিন চার হাজার বছরের প্রাচীন। সোনার বল্গা হরিণও আছে। আমরা রূপকথায় পড়েছি সোনার হরিণের গল্প। সেই সোনার হরিণ আজ দাঁড়িয়ে আছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। রূপকথা নয়, বাস্তব সত্য। হীরার তৈরী ছড়ি ও আংটিও আছে। সাইবেরিয়া অঞ্চলে একটি নদীর

Scanned with CamScanner

পাড় ভেঙ্গে পড়ায় এগুলো পাওয়া গিয়েছে। কত ঐশ্বর্য হিসাব করা কঠিন, কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায়না। আরও অনেক, অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল এদের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দেশকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য ইউরোপ আমেরিকার কাছে কিছু ঐশ্বর্য বিক্রী করতে হয়েছে। তবু এখনও অনেক গড়ে তোলার কাজ বাকী, সুতরাং আরও হয়তো বিক্রী করতে হবে।

একটার পর একটা ঘর দেখে চলেছি, দেখার শেষ নেই বলে মনে হচ্ছে। কত ঘর আছে?—তিন শ'। তিন শ'টা ঘরই এমনি সাজানো। দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তবুও যে দেখবার স্পৃহা মিট্‌লো না। কিন্তু সত্যিই আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছেনা, পা অবশ হয়ে আসছে, কোমর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। গ্রীক আমলের গহনাগুলো, অদ্ভুত অদ্ভুত তার আকৃতি। মাথার মুকুট পাতা লতা সবই সোনায় মোড়া। হাতের চুড় একেবারে আমাদের দেশের মকর-মুখো বালার মত। না, এবার বিদায় নিতেই হচ্ছে—ইচ্ছা থাকলেও আর দেখবার উপায় নেই। সময় ফুরিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যায় পৌছালাম পাইকারী কবরখানায়, যেখানে যুদ্ধের সময় মৃত দেশপ্রেমিকদের কবর দেওয়া হয়েছে। জার্মান অধিনায়ক হিট্‌লার যখন একাদিক্রমে নয় শ' দিন লেলিনগ্রাড শহরকে অবরোধ করে রেখেছিলেন, সেই চরম দুর্দিনের সময় দারুণ শীতের প্রকোপে এবং অনাহারে বহু লোককেই প্রাণ দিতে হয়েছিল। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। তাই দেশের শতকরা আশিজন লোককে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। ওদিকে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিয়েছিল দেশের প্রতিটি সক্ষম পুরুষ। সে ভয়াবহ দিনের কথা গল্প করতে বসে এরা ক্ষণে ক্ষণে ম্লান হয়ে যায়। দেশে একটি বয়স্ক পুরুষ জীবিত ছিলনা, ছিল শুধু নারী ও শিশুরা।

কবরস্থানে প্রবেশ করলাম। ২৪ ঘন্টা গ্যাসের আলো জ্বলছে।

সেই সময়কার জনসাধারণের চরম অবস্থার নানারকম আলোকচিত্র ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। একটি ছোট মেয়ের ডায়েরীর পাতার আলোকচিত্রও আছে। আট বছর বয়স্কা এই মেয়েটী তার আঁকাবাঁকা হাতের লেখা দিয়ে দিনপঞ্জীতে লিখে রেখেছে কয়েকটি বেদনাময় দিনের ইতিহাস। অনাহারে এবং উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে একের পর এক তার আত্মীয়রা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করছে আর সেই ঘটনা গুলোকে স্মরনীয় করে রাখছে মেয়েটি তার দিনপঞ্জীর পাতায়। ঘটনাগুলোর কথা পড়তে পড়তে দৃষ্টি আপনা থেকেই ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। পরিণতিটা আরও মর্মান্তিক। ঐ ইতিহাস রচয়িত্রী বালিকাটিও যুদ্ধের বিভীষিকার হাত থেকে রেহাই পেলনা, কিন্তু রেখে গেল এমন ইতিহাস যা কালের স্বাক্ষর হয়ে রইল।

সন্ধ্যা সাতটায় গেলাম Home for Old Artists দেখতে। সিনেমা, থিয়েটার বা ব্যালের যে সকল প্রখ্যাত শিল্পী বর্তমানে বার্ধক্যে এসে পৌচেছেন তাঁদের জন্যই হোম। কলকাতায় দেখেছি খ্রীষ্টানরা বুড়ি বুড়ি মেম সাহেবদের নিয়ে কতকটা এই ধরণের হোম করেছে। রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করবার সময় আমরা দেখতে পেতাম ঐ বুড়িগুলো সারাদিন বসে বসে উল বুনতো আর খোসগল্প করতো। কিন্তু এদেশের বুড়োবুড়িরা একেবারে অন্য ধরণের।

আমাদের গাড়ীটা বিস্তর অলিগলি ঘুরে, খাল পার হয়ে শেষে সহরতলীর এক বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু এখন বৃষ্টিটা যেন একটু জোর দিয়ে এলো। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এই বৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা মহিলা, বয়স তাঁর আশির কোঠা পার হয়েছে অথচ এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁদের অফিসঘরে। ক্রমে আরও অনেকে এসে জমায়েত হতে লাগলেন সেখানে। আলাপ হোল অনেকের সঙ্গেই। শুনলাম সবিনা নাম্নী এক শিল্পী প্রথম এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। আশ্রম-প্রাঙ্গণে তাঁর

কবর রয়েছে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। এককালে যাঁরা দেশের জনসাধারণকে প্রতি সন্ধ্যায় আনন্দ দান করতেন আজ বার্ধক্যের দরুণ যদি তাঁদের কপালে আহার না জোটে তাহলে সেটাতো জাতির চরম লজ্জার কথা। তাই এই আয়োজন, এই ব্যবস্থা। যাঁরা একদিন হাজার হাজার ব্যক্তির মনে আনন্দ জাগিয়েছে আজ তাঁরা অশক্ত বলেই কি তাঁদের ফেলে দেওয়া যায়? কখনই নয়। তাঁরা সবাই আদরের, সম্মানের। তাই এদেশ তাঁদের মাথায় করে রাখে, তাঁদের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে। সেই জন্যই এই হোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চাশের উর্ধে যাদের বয়স তাঁরাই এখানে স্থান পাবেন। এদের সকল খরচা সরকার বহন করে। তাছাড়া বাইরে ঘোরা-ফেরার জন্য এদের ফ্রি বাস-টিকিট দেওয়া হয়। ইচ্ছে করলে সন্ধ্যার দিকে সিনেমা-থিয়েটার দেখেও সময় কাটাতে পারেন। এই সব স্থানেও তাঁদের অবাধগতি। আরও অনেক রকমের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এদের নিজেদের এখানে বিরাট লাইব্রেরী আছে। সকল রকম বাদ্যযন্ত্র আছে, টেলিভিশনও আছে। সুতরাং সময় এদের ভালই কাটে।

অতঃপর খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল আমাদের। ঘরটা বেশ বড় আর সুন্দর করে সাজানো। মাঝখানে বড় ডিম্বাকৃতি টেবিল, তার উপর নানারকম খাদ্যদ্রব্য সাজানো। তাঁদের একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বসতে হোল কিছু খেতে। যাঁরা বাকীছিলেন তাঁরাও এসে বসলেন এইবার। থুড়থুড়ি বুড়িও আছেন কয়েকজন। স্বামী-স্ত্রীও বাস করতে পারেন এখানে। অনেক সময় ছেলেমেয়ের হাতে সংসারের ভার তুলে দিয়ে বৃদ্ধ পিতামাতা এখানে চলে আসেন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে আলাদা ঘর। খাওয়ার পর্ব শেষ করে তাঁদের ঘর দেখতে গেলাম। সবাই তাঁর নিজের নিজের ঘর দেখাবার জন্য উৎসুক। কয়েকটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেকটি ঘরের সাজ-সজ্জা প্রায় একই ধরণের। ঘরের দেয়ালময় ছবি। আত্মীয় স্বজনের ছবিতো আছেই তাছাড়া আছে নিজেদের যৌবন বয়সের ছবি। অভিনয় কালে

রূপসজ্জায় দাঁড়িয়ে আছেন তরুণ নায়ক নায়িকা। দেখে বোঝ-বার উপায় নেই যে এসব বৃদ্ধ বৃদ্ধাই একদিন রূপে ও অভিনয়ে দর্শকদের মন হরণ করে নিতেন। ওরই মধ্যে এক ভদ্রমহিলা দেখালেন তাঁর আত্মীয় স্বজনদের চিত্র। তাঁরা সবাই অতীতকালে নাট্যশিল্পী ছিলেন, সুতরাং শিল্পকলা তাঁর রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে। এ শিল্প ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন?

রাত বাড়ছে। এবার বিদায় নিতে হবে কিন্তু বিদায় দিতে তাঁদের মন চায়না। বারবার অনুরোধ হচ্ছে, আবার এসো, আমরা অপেক্ষা করে থাকবো। আসা যে সম্ভব নয়-সেকথা অনেকেই বুঝেও যেনো বুঝতে চান না।

দু'দিনের ভ্রমণ সমাপন করে লেলিনগ্রাড ত্যাগ করলাম রাত্রে। আবার ফিরে চললাম মস্কো অভিমুখে। সেই একই ট্রেন, যার নাম রেড ষ্টার বা লাল তারকা। এবারও রাত্রে ভ্রমণ করছি, সুতরাং বাইরের কোলাহলময় জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে সুপ্তির কোলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

মস্কোতে পৌছালাম সকালে। আজকেই আবার আমাকে রওয়ানা হতে হবে তিরলিসীর উদ্দেশ্যে। সাড়ে তিনটায় আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভ্রমণ শুরু হবে সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ছুটী।

দু'টো বাজতেই মারিয়া গ্রিজুনোভা এবং মার্ক গ্যানকিন এসে হাজির হোল। এরাই হবে আমার এবারকার সঙ্গী। রুশদেশের বিমানগুলো কিন্তু মোটেই সুবিধাজনক নয়। যান্ত্রিক দিক থেকে হয়তো নিখুঁত হবে কিন্তু ভিতরের সাজসজ্জা আসবাবপত্র মোটেই ভাল নয়। বরং আমাদের পি, আই, এ-র তুলনায় একেবারেই সাধারণ, খানিকটা অপরিষ্কারও মনে হোল। তবে পাইলট ও তার সহকারী কর্মীরা অত্যন্ত অমায়িক। বারবার তারা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে আমার খোঁজ করে যাচ্ছিল। আজকের আকাশটা পরিষ্কার থাকায় কিছুটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও নজরে পড়লো। বৈমানি-

CS Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

কের সহকারী বাইরে এসে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে একবার আমাকে স্পেশাল চা-ও খাওয়ানো হোল।

ইতিমধ্যে তিব্‌লিসী সম্পর্কে মারিয়া আমাকে কিছুটা জ্ঞানদান করলো। তিবলিসী জর্জিয়া প্রদেশে অবস্থিত। এই জর্জিয়া প্রদেশটি অত্যন্ত প্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকেরা এই দেশে বাস করতো। প্রাচীন জর্জিয়া অত্যন্ত উন্নত দেশ বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই প্রদেশটি প্রায়শ: রৌদ্রোজ্জ্বল বলেই এর নাম জর্জিয়া। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে এইটিই অপেক্ষাকৃত গরম প্রদেশ। এই প্রদেশটির মোট আয়তন ৭০,০০০ স্কোয়ার কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। এই প্রদেশটিরই রাজধানী হচ্ছে তিব্‌লিসী।

জর্জিয়া প্রদেশটি ধাতু ও খনিজ সম্পদ (Mineral resources)-এ সমৃদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু এই প্রদেশে পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া কয়লা, তেল, লোহা প্রভৃতিও আছে এখানে।

রাজধানী তিব্‌লিসীকে এরা সংক্ষেপে বলে বিলিসী। এই বিলিসী সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, প্রায় পনর শত বৎসর পূর্বে জার ভাকতাং গরগোসাল (Vaktang Gorgosal) একদা (জর্জিয়ার প্রাচীন রাজধানী) মিস্‌কেটার অদূরবর্তী বনে শিকার করছিলেন। সেই সময় জারের প্রিয় পোষা বাজপাখীটি অন্য এক বাজপাখীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে নিকটবর্তী উষ্ণ জলপ্রপাতে পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত দগ্ধ হয়। তখন জার এই স্থানটিকেই বেছে নিয়ে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং এর নামকরণ করেন 'বিলিসী,' যার অর্থ গরম।

গল্পের ভিতর দিয়ে সময় কখন অতিবাহিত হয়েছে বুঝতেই পারিনি আমরা। বৈমানিক ঘোষণা করলেন, বিমানটি বিলিসী পৌঁছে

গিয়েছে। আমরা এখনই বিমান বন্দরে অবতরণ করবো। বিমান বন্দরে যখন বিমানটি অবতরণ করলো তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এখানকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট মহিলারা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ফুলের মালা আর তোড়ায় আমার দু'হাত ভর্তি হয়ে গেল।

ডোরডিয়াসভ্যালী রোডে অবস্থিত শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেল বিলিসীতে এসে পৌঁছালাম। বিমানবন্দরের কনকনে শীতে হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। আমার জন্য এঁরা যে 'সুইট' ঠিক করে রেখেছিলেন সেখানে আমাকে পৌঁছে দিয়ে সবাই বিদায় নিলেন। রাত্রে কোন প্রোগ্রাম করা হয়নি শুনে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠাণ্ডা লাগায় তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নেবার জন্য শরীরটা তখন সত্যিই বড় আকুলি-বিকুলি করছিল।

পরের দিন বেলা দশটায় আমি শহর প্রদক্ষিণ করতে বের হলাম। আমাকে শহর দেখাতে নিয়ে চললেন এখানকার মহিলা সংস্থার বিশিষ্ট সদস্যা নীনা। শহরের মাঝখান দিয়ে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদীটির নাম কুরা। এই নদীর একপাশ দিয়ে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দশম শতাব্দীর একটি গির্জা। গির্জাটি এক ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দশম শতাব্দীতে নির্মিত এই গির্জাটি কালের সাক্ষীরূপে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পুরাতন শহরে অবস্থিত আরও একটি গির্জা দেখলাম। এই গির্জাটি দ্বাদশ শতাব্দীর। প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে জারিনা তামারার সঙ্গে যুবরাজ যুরী বোগোলি-ভিস্কির বিবাহ হয় এই গির্জাতেই। এই গির্জাটিতে একটি ছোট তালাবদ্ধ প্রকোষ্ঠে একটা কাঠের বড় বাক্স রক্ষিত আছে। সঙ্গিনী বললেন, ঐ বাক্সে যীশুখৃষ্টের ব্যবহৃত কিছু কাপড়চোপড় সযত্নে রক্ষিত আছে। কাচের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টা করলাম। শুধুমাত্র কাঠের বাক্সটি এবং কয়েকটি মোমবাতিদান

Scanned with CamScanner

ব্যতীত আর কিছু নজরে পড়লো না। অন্যান্য গির্জাগুলোর মত এই গির্জাটিরও দেওয়ালে বিরাট বিরাট চিত্র অঙ্কিত আছে। তবে এই গির্জার অধিকাংশ চিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও এগুলো বিলিসীর অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আজও দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম এদের নব-নির্মিত ভেক্ পার্ক দেখতে। বিলিসী শহরটাই পাহাড়ের উপর। ছোট ছোট বহু পাহাড়ে ঘেরা এই শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ। এই নব-নির্মিত ভেক পার্কটিও শহরের মাঝখানে এমনি একটা পাহাড়ের গায়ে নির্মিত হয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে শহর নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। এদৃশ্য অপূর্ব মনোমুগ্ধকর। পার্কের ভেতরে স্থানে স্থানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করছে আপন মনে। কয়েকজন মাটি দিয়ে ঘর তৈরী করবার প্রয়াস পাচ্ছে। গুটিকতক ছেলেমেয়ে ফোয়ারার পানিতে নৌকো ভাসানোর চেষ্টা করছে, আবার অনেকে সঙ্গীদের নিয়ে চোর চোর খেলছে। নানা বয়সের ছেলেমেয়ে মহা আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। ছোট শিশুদের গায়ে মুক্ত আলো বাতাস লাগানোর জন্য তাদের বাবা-মা সন্তানদের এখানে এনে ছেড়ে দেয়। তারা আপন মনে খেলা করে। অদূরে বেঞ্চিতে বসে থাকে প্রহরারত পিতা মাতা, তাদের হাতে একখানা বই বা পত্রিকা।

একটা জিনিষ আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছি যে এদেশের লোকেরা খুব বই-পাগলা। এরা সবাই বই পড়তে ভালবাসে। কর্মব্যস্ত জীবনে সামান্য অবসর পেলেই বই নিয়ে বসে এবং এই কারণেই এদের দেশে বই-এর অভাব নেই। অবশ্য বিদেশী ভাষার বই বা বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বই খুব কমই নজরে পড়ে। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানী করার কোন প্রয়োজনও নেই। এদের নিজেদের রচিত, নিজেদের ভাষায় এত বই আছে যা রীতিমত গৌরবের বস্তু।

ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম যাদুঘরে। এখানেও রক্ষিত আছে

বহু প্রাচীন চিত্র। বিখ্যাত প্রাচীন চিত্রকরদের অঙ্কিত নানারকম ছোট বড় চিত্র সজ্জিত আছে এখানেও। সরু প্যাসেজ পার হয়ে ঢুকলাম যে ঘরে সেখানে আছে প্রাচীন রত্ন এবং নানারকম মূল্যবান অলঙ্কার। দেয়ালে টাঙ্গানো আছে বিরাট বিরাট চিত্র। সবই বাইবেলের ঘটনাকে বা চরিত্রকে নিয়ে অঙ্কিত। এই চিত্রগুলোর ফ্রেম গোটাটাই সোনার এবং তার গায়ে নানারকম মণিমুক্তা বসানো। এরমধ্যে কয়েকটি চিত্রে কিছুটা মুসলমানী প্রভাব লক্ষ্য করলাম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, ওগুলো তুরস্ক থেকে আহরিত হয়েছে। যাদুঘরের অধ্যক্ষ যিশুখৃষ্টের একখানা বিশালাকৃতি চিত্র দেখিয়ে বললেন, সেটি নাকি সারা পৃথিবীতে সোনার ফ্রেমে আঁটা সবচেয়ে বড় চিত্র। এই ফ্রেমটি প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এবং ওজন প্রায় এক মণের কাছাকাছি। এছাড়া নানা আকৃতির ও নানা কলা-কৌশলের নস্যির কৌটাও আছে। অনেক নস্যির কৌটার সঙ্গে জড়িত আছে বিচিত্র ইতিহাস। কোনটা জারের ব্যবহৃত নস্যির কৌটা, কোনটা বা বিখ্যাত চিত্রকরের ব্যবহৃত কৌটা, কোনটা এদেশের নামকরা কবিদের ব্যবহৃত—এমনিতর পরিচয় জড়ানো আছে এইসব কৌটার সঙ্গে।

হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ম্যাডাম নীনা তাই প্রস্তাব করলেন এখানকার মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত কোট তৈরীর একটী ফ্যাক্টরী দেখার। প্রস্তাবটায় আমিও সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম। লেনিনগ্রাডে যে টুপি তৈরীর কারখানা দেখেছিলাম তার সঙ্গে এইটির যথেষ্ট মিল আছে দেখলাম। এখানেও মহিলারাই সব কাজ করছেন। লম্বা হলঘরে মেশিনের পর মেশিন সাজানো আছে আর তাতে কাজ করছেন নানাবয়সী মহিলারা। তবে কোটের ডিজাইনগুলো খুবই সুন্দর। খুব দামী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কোটও এখানে তৈরী হচ্ছে। শিশুদের কোটগুলো খুবই আকর্ষণীয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে এদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করলাম। এরা আপন-

Scanned with CamScanner

মনে কাজ করে যাচ্ছে, কোথাও ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই। অনেকটা যন্ত্রের মতই সবাই কাজ করে চলেছে। একদিকে এর যেমন সুবিধা যে কাজ ঠিকমত হচ্ছে, তেমনি একটা অসুবিধাও আছে। মানুষ যেন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে ফিরে গেলাম হোটেলে।

বিকেল পাঁচটায় চললাম এখানকার প্যালেস অফ্ পাইওনিয়ার্স দেখতে। আমার হোটেল থেকে খুব কাছেই এই প্রতিষ্ঠানটি। তাই হেঁটেই যাব সাব্যস্ত করলাম। হোটেল থেকে পথে নামতেই ভিড় জমে গেল আমার চারদিকে। তাদের ভাব দেখে মনে হোল যেন চিড়িয়াখানার কোন জন্তু দেখছে তারা। হেসে আমি এই মন্তব্য করতেই মারিয়া গ্রিজুনোভা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, না না আসলে আমাদের এদেশবাসীরা ইউরোপীয়ান পোষাক দেখতেই অভ্যস্ত—তাই নূতন পোষাক পরিহিত নূতন দেশের মানুষ দেখলেই এরা বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। এরই মধ্যে দু' একজন সাহসী যুবক এগিয়ে এসে মারিয়াকে প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছে আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? মারিয়াও বেশ হাসিমুখে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। আমি পাকিস্তানের একজন পার্লামেন্টারিয়ান শুনতেই তাদের চোখে মুখে সম্ভ্রম ফুটে উঠছে লক্ষ্য করলাম। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি তা দিয়ে তোমাদের মত পথচারীর কি দরকার বাপু—কিন্তু তাদের কৌতুহল না মিটিয়ে এগিয়ে যাবার উপায় নেই এমনি ভিড় সারা পথে। তাই পাঁচমিনিটের পথ অতিক্রম করতে লাগলো প্রায় আধঘন্টা। আর এই কারণেই আমরা নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট পরে পৌঁছালাম প্যালেস্ অফ পাইওনিয়ার্সে। মস্কোতে আমি প্যালেস-অফ-পাইওনিয়ার্স পরিদর্শন করেছি, কাজেই এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আমার আছে। এখানকার প্রতিষ্ঠানটিও বিরাট অট্টালিকায় অবস্থিত, কিন্তু মস্কোর মতো এদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ নেই। ডাইরেক্টার নিজে সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। ছোট ছেলেমেয়েদের নাচ দেখলাম।

জর্জিয়ার জাতীয় নৃত্য। একটি ছেলে ও একটি করে মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। এদের নাচ দেখে নিজের দেশের কথা মনে পড়লো। খুব বেশী মিল আছে এদের এই নৃত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের নৃত্যের। নানাবয়সী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে এখানে নাচ শেখে।

একটা ঘরে দেখলাম খুব ছোট ছেলেমেয়েরা—যাদের প্রায় শিশু বলা চলে, নানারকম গাছের শুকনো ডালপালা এবং শুকনো ফলমূল নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরী করছে। ভারী সুন্দর এই খেলনা-গুলো। এমনি দেখে বোঝা মুস্কিল যে এইসব খেলনা শিশুদের তৈরী। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম কি রকম নিপুণ কারিগরের মত খেলনা তৈরী করছে শিশুরা। মনের আনন্দে তাদের নিজেদের তৈরী জিনিষ সাজিয়ে রাখছে কাচের আলমারীতে। সবকটি বিভাগ পরিদর্শন করে অবশেষে ডাইরেক্টারের খাস্ কামরায় এসে বসলাম। চা খাওয়ার পর্ব শেষ করে বিদায় নেবার কালে দুজন ছোট শিশু ঘরে প্রবেশ করলো। হাতে তাদের নিজেদের তৈরী কাগজের জর্জিয়ান পুরুষ ও নারীমূর্তি। নাচের ভঙ্গীতে তৈরী মূর্তিদুটো উপহার পেয়ে আমি চমৎকৃত হলাম। খেলনা দুটোর প্রসংশা শুনে শিশুদের মুখে যে আনন্দের জ্যোতি দেখা গেল সেটা অমূল্য সম্পদরূপে জমা হয়ে রইলো আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়।

এই সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে শিশুদের জীবনের সার্থক বিকাশ রূপলাভ করেছে তাদের নিজেদের অজ্ঞাতে। শিশুরা ভবিষ্যৎ জাতির স্রষ্টা, কর্ণধার ও অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্ম এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে। এর সুফল যে কত সুদূর প্রসারিত সেকথা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে চিন্তারও অতীত।

শিশুদের রাজ্য থেকে বিদায় নিতে হোল, ইচ্ছা থাকলেও আর বসবার উপায় নেই। আরও অনেক কাজ রয়েছে, অনেক কিছু দেখ-বার আছে। কাজেই, সময় বড় মূল্যবান। তাই বাধ্য হয়েই আনন্দময় পরিবেশ থেকে, অফুরন্ত ফুর্তির রাজ্য থেকে বিদায় নিলাম। যেটুকু

Scanned with CamScanner

সময় এদের মধ্যে কাটিয়েছি, সেই আনন্দ মিশ্রিত সময়টুকু হৃদয়ের মণিকোঠায় অমূল্য সম্পদ রূপে ও অক্ষয় স্মৃতিরূপে জমা হয়ে রইলো।

পথে নেমে মারিয়া ত্রিজুনোভাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অত:কিম্'? বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে এর পরের প্রোগ্রাম কি? একগাল হেসে সে উত্তর করলো, 'তাই বল, এবার ডকুমেন্টারী ছবি দেখানো হবে।'

হেঁটে হেঁটেই এসে পৌছালাম এক বিরাট অট্টালিকার চত্বরে। এই প্রাসাদে বিলিসী সরকারের প্রধান অফিস অবস্থিত। এখানে কয়েকজন মহিলা এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার অভ্যন্তরে। এই অট্টালিকাটিকে মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রণাগার বলে অভিহিত করা হয়। মন্ত্রীপরিষদের জনৈকা সদস্যা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের এই ডকুমেন্টারী চিত্র দেখবার জন্য। গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। খানিকটা এগিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। একেবারে প্রধান হলঘরে উপস্থিত হলাম যেখানে চলচিত্র প্রদর্শিত হবে। হঠাৎ সবটাই আমার কাছে গোলক ধাঁধাঁর মত মনে হোল। কোথা দিয়ে কিভাবে এখানে পৌছালাম কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। ঘরটা অন্ধকার, টর্চ ধরে আমাদের নিয়ে বসানো হোল।

প্রথমে জর্জিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রদর্শিত হোল। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঐশ্বর্যময়ী দেশগুলোর চিত্র খুবই উপভোগ করলাম। এদেশের প্রাকৃতিক রূপের সঙ্গে আমাদের বাঙ্গলা দেশের রূপের খুব মিল আছে। এখানকার গ্রামগুলোও সবুজ শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত, যেমন আচ্ছাদিত আমাদের শ্যামলমাটীর বাঙ্গলাদেশের গ্রাম।

এরপর একটা পরীর গল্পের ছবি দেখানো হোল। সেই চিরপুরাতন অথচ চির নতুন পরীর গল্প যা সকল যুগের সকল দেশের শিশুদের মন হরণ করে নেয়। গল্পটার বিষয়বস্তু হোল, এক রাজার কোন

সন্তান হয় না। শয়তান এসে ফল দিয়ে গেল। এই ফল খেলে সন্তান হবে, কিন্তু সর্ত হচ্ছে একটি সন্তানকে দান করতে হবে। তারপর সেই সন্তান বড় হয়ে কি করে শয়তানের হাত থেকে নিজেকে ও দেশবাসীকে রক্ষা করলো সেই লম্বা কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণীর এখানে প্রয়োজন নেই। এই ধরণের গল্প আমাদের দেশের ঘরে ঘরে শিশুরা শুনে আসছে নানী-দাদীর মুখে। কিন্তু এ রকম ছবি হয়তো তারা আজও দেখেনি।

সবশেষে দেখানো হোল রুশদেশের বিখ্যাত ব্যালে নৃত্যনায়ক চুবকিয়ানীর পরিবেশনায় শেক্সপিয়ারের নাটকশ্রেষ্ঠ ওথেলোর ব্যালে নৃত্য। চুবকিয়ানী নিজে প্রধান নায়ক অর্থাৎ কাফ্রী ওথেলোর নাম ভূমিকায় রূপদান করেছেন। রুশদেশের ব্যালে নৃত্য পৃথিবীজোড়া নাম কিনেছে। বিশেষ করে চুবকিয়ানীর মত ব্যালে নর্তক নাকি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জন্মায় নাই। অভিভূত হয়ে গেলাম এই ব্যালের চিত্ররূপ দেখে। দুর্ভাগ্য আমার যে চুবকিয়ানীর ব্যালে বাস্তবে দেখবার সুযোগ হোলনা। কিন্তু তার চিত্ররূপ দেখেই ধারণা করা যায়, কি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই নায়ক। সত্যি তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে নৃত্যনায়ক হবার যোগ্যতা রাখেন।

আজ ২২শে নভেম্বর। সকাল দশটায় যেতে হবে এখানকার বিখ্যাত রেশম কারখানা পরিদর্শন করতে। তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছি ম্যাডাম নীনা ও মার্ক গ্যানকিন-এর। এরাই এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। নির্ধারিত সময়ের অর্ধঘন্টা পরে এসে হাজির হলেন তাঁরা। তাড়াহুড়ো করে সব গাড়ীতে গিয়ে বসলাম।

শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই রেশম কারখানাটি। এই কারখানার ডাইরেক্টার একজন মহিলা। আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত কারখানাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সবশেষে যে ঘরটিতে আমাদের

নিয়ে এলেন তার চারদিকের দেয়ালে সিল্কের নানা রংয়ের কাপড় ঝুলছে। দেয়ালের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয়না, সবটাই কাপড় দিয়ে ঢাকা। সমগ্র দেয়ালটা ঘিরে ঝুলছে কাপড় আর কাপড়। সিল্কের উপর ছাপা জর্জেট, সিফন, সুতী সব রকম কাপড়ই আছে। কতকগুলো কাপড়ের ছাপা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, তবে দামে মোটেই সুবিধাজনক মনে হোল না। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তাদের দেশের মানুষের আয় হিসাবে প্রত্যেক বস্তুর দাম নির্ধারিত হয়েছে। একথা সত্যিই। ও-দেশের সাধারণ মানুষের আয় আমাদের দেশের তুলনায় দশগুণ বেশী। সেদিক থেকে বিচার করে দেখলে কোন জিনিষের মূল্যই বেশী নয়। কিন্তু হঠাৎ কোন জিনিষের দাম শুনলে পিলে পর্যন্ত আঁতকে ওঠে। ডাইরেক-ট্রেস ভদ্রমহিলা জানালেন যে মাত্র অল্প কয়েক বছর থেকে তাঁরা সুন্দর আকর্ষণীয় ডিজাইনের কাপড় তৈরী করতে মন দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এদিকে তাঁরা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু এখন তাঁদের দেশের মেয়েরাও যেন সুন্দর কাপড় পরে সুদর্শনা হয়ে ওঠেন সেই প্রচেষ্টা চলছে।

এখানেও আদর আপ্যায়ণের পুরো আয়োজন করা হয়েছে। খুব ঘটা করেই আমাদের চা এবং তার সঙ্গে নানারকম মিষ্টি ও ফলমূল পরিবেশন করা হোল। চা পান পর্ব সাঙ্গ হবার পর আমি অভিলাস প্রকাশ করলাম যে এই কারখানার শ্রমিকরা যে গৃহে বাস করে আমি সেই গৃহগুলো পরিদর্শন করতে চাই। মনে সন্দেহ ছিল তাঁরা হয়তো আমার এই প্রস্তাবে রাজী হবেন না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। ডাইরেক্ট্রেস মহিলাটিরই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখা গেল।

দু'টো গাড়ীতে করে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটা পাঁচতলা বাড়ীর সম্মুখে এসে নামলাম। এক গাড়ীতে

জর্জিয়ার প্রাচীন রাজধানীর সৌধ সম্পদরাজী পরিদর্শন করছেন লেখিকা

CS Scanned with CamScanner

CS Scanned with CamScanner

মার্ক গ্যানকীন, ম্যাডামনীনা, ম্যাডাম মারো নামক স্থানীয় এক মহিলা এবং আমি এলাম। আরেক গাড়ীতে এসে নামলেন ডাইরেকট্রেস, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ ফ্যাক্টরীর খুব নামকরা কর্মী, বীরাঙ্গনা বলে পরিচিতা লেলিন পুরস্কার প্রাপ্তা এক মহিলা যাঁর নাম আজ মনে করতে পারছিনা। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম এই বাড়ীর মত আরও অনেক বাড়ী আশেপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যে বাড়ীটার সম্মুখে আমরা নেমেছিলাম তারই দোতালায় উঠলাম। ঘুরে ঘুরে দেখলাম, দুটো করে ঘর নিয়ে এক একটি ফ্ল্যাট তৈরী হয়েছে। তার সঙ্গে আছে বাথরুম ও রান্নাঘর। সাধারণ একজন শ্রমিকের ঘর দেখছি আমি। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। দরজা দিয়ে ঢুকতেই প্যাসেজ, তারই দু'পাশে দু'টো ঘর। এই সরু প্যাসেজের একপাশে গদীমোড়া দু'টো চেয়ার পাতা, পাশে ছোট একটা টেবিলে টেলিফোন আর দেয়ালে ঘর সাজানোর নানারকম সৌখীন জিনিষ। মোটকথা এই প্যাসেজটাই তাদের ড্রয়িংরুমের কাজ করছে।

শোবার ঘরে প্রবেশ করলাম। দু'টো খাটপাতা আছে পাশাপাশি, তাতে পরিপাটী করে বেড কভার দিয়ে বিছানাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। খাটের পাশেই আরাম করে বসবার জন্য একখানা আরাম কেদারা পাতা আছে। বেড সাইড টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প, আরেকধারে ড্রেসিং টেবিলও আছে। মনে মনে ভাবছি যে এরা কি সত্যিই আমাকে শ্রমিকদের বাড়ী দেখাতে এনেছে না কি ভুল করে অন্য কোথায়ও নিয়ে এসেছে।

পাশের ঘরে এলাম। এটা বসবার এবং খাবার উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়। ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল, তার দু'ধারে রেক্সিনের গদীআঁটা চেয়ার, দেয়ালের দু'ধারে দু'টো কাচের আলমারী। এর একটাতে নানারকম সৌখীন জিনিষপত্র ও কিছু কিউরীও। অন্য আলমারীতে কাচের থালা বাসন গ্লাস জগ কাপ ইত্যাদি সাজানো। ঘরের দেয়ালে কতকগুলো সুন্দর ছবিও টাঙ্গানো আছে। দেখছি

আর অবাক হচ্ছি, এই নাকি আমি একজন সাধারণ শ্রমিকের বাড়ী দেখছি। আমাদের দেশের যে কোন উঁচু স্তরের বড় লোকের বাড়ীর সঙ্গে এ বাড়ীর তুলনা করা চলে। উপযুক্ত আসবাব পত্রের সাহায্যে এমন সুন্দর করে, পরিপাটী করে সাজানো গোছানো বাড়ী দেখে আমি সত্যিই হতভম্ভ হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের শ্রমিকদের কথা। অধিকাংশ শ্রমিকেরই মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। ভাঙ্গাগড়ার পর্ব এখনও চলছে সেখানে। আমাদের দেশ তাই আজও তার সন্তানদের বাসস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশা দিতে পারছেনা। এদের বাসস্থান দেখে সত্যিই গায়ে জ্বালা ধরে যায়। কত ঐশ্বর্যের অধিকারী হলে আর কত সম্পদশালী হলে তবেই একটি দেশ তার সাধারণ শ্রমিকদের বাসের জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থা করতে পারে।

এই গৃহের কর্ত্রী আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু খেতে বাধ্য হলাম, কারণ গৃহকর্ত্রী নাছোড়বান্দা। কত করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এইমাত্র তাদের ফ্যাক্টরী থেকে খেয়ে আসছি কিন্তু কে কার কথা শোনে। খেতে রাজী হওয়া মাত্র নানারকম খাদ্যসম্ভারে খাবার টেবিল ভরে গেল। দ্বিতীয়বার অবাক হবার পালা—এত খাদ্য-সম্ভার একজন সাধারণ শ্রমিকের বাড়ীতে! আমার তো চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়। একটু সন্দেহ প্রকাশ করলাম যে এই সবই পূর্ব আয়োজিত। বীরাঙ্গনা ভদ্রমহিলাটি তৎক্ষণাৎ আমাকে বললেন যে আশেপাশে যে কয়টি বাড়ী আছে সবগুলোতেই এই মিলের শ্রমিকেরা বাসকরে। আমার মনে যদি সামান্যতম সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে ঐ বাড়ীগুলোর যেটাতে খুশী যে ফ্ল্যাটে খুশী গিয়ে দেখে আসতে পারি। সবগুলো বাড়ী একই ধরণে সাজানো, একই ভাবে তারা বসবাস করে। তাঁর কথা শুনে লজ্জিত হলাম। অকারণে মনে সন্দেহ জেগেছিল বলে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগলো।

গৃহকর্ত্রীর আপ্যায়ণের আতিশয্যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার যোগাড় হোল। প্রথমেই তিনি মোষের শিংয়ের তৈরী দু'টো পানপাত্র নিয়ে এলেন। পাত্রে মদ ঢেলে গৃহকর্ত্রী ও অতিথি একে অপরের হাতের মধ্যে হাত দেয় অর্থাৎ হাত ক্রশ করে মদ্যপান করে। এটাই রীতি। কাজেই আমার উপর পীড়াপীড়ি চলতে লাগলো এই নিয়মে মদ খাওয়ার জন্য। আমি বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমাদের দেশে মদ্যপান ধর্মবহির্ভূত, সুতরাং ওটা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিতান্ত বিপাকে পড়ে আমার সঙ্গিনী ও দোভাষী মারিয়া গ্রিজনোভার কাছে আবেদন জানালাম আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। শেষে মারিয়ার প্রচেষ্টায় ভদ্রমহিলা আমাকে অব্যাহতি দিলেন।

এইবার দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হোল। 'এটা খাও, 'ওটা খাও' করে ভদ্রমহিলা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ভয়ে ভয়ে কিছু খেলাম, কিন্তু তারও সীমা আছে। অতিরিক্ত আপ্যায়ণের চোটে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অগত্যা বাধ্য হয়ে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার প্যাকেট করে সঙ্গে নিতে রাজী হয়ে গেলাম।

এখান থেকে বের হয়ে আমরা এবার পৌছালাম এক কনসার্ট হলে। এখানে জর্জিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের গান ও বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। নানা বয়সের মেয়ে ও পুরুষ মিলে গান ও বাজনা শুনিয়ে গেল। এগুলো ঠিক না বুঝলে তেমন আকর্ষণীয় বা শ্রুতিমধুর বলে মনে হয় না। একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক কিছু হাস্যরস পরিবেশন করলেন। এইটা অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল বলে মনে হোল, কারণ তাঁর প্রত্যেকটি উক্তির সঙ্গে দর্শকবৃন্দের সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। এখান থেকে হোটেলে ফিরে এলাম ছ'টায়। মারিয়া জানালো, এখন একটানা আড়াই ঘন্টা আমার ছুটী। সাড়ে আটটায় ডিনারে যেতে হবে। স্থানীয় পুরুষ ও মহিলারা একযোগে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

আমার সম্বর্ধনার জন্য এই ডিনারের আয়োজন করেছেন।

ঠিক সাড়ে আটটায় মার্ক ও মারিয়ার সঙ্গে ডিনার হলে পৌছালাম। তখনও সেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ এসে পৌছাননি। যে ক'জন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে এক একে পরিচয় করলাম। এঁদের মধ্যে একজন মহিলামন্ত্রীও আছেন। পার্লামেন্টের সদস্য ও সদস্যাও আছেন কয়েকজন। আর আছেন স্থানীয় এক পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটির নাম 'জারিয়া ভাস্তোকা'। এই পত্রিকাটি বিলিসীতে খ্যাতি লাভ করেছে। পত্রিকার সম্পাদকের নাম ইরাকেলি চিকৃভিচ্ ভিলে। খুব অদ্ভুত নাম, কাজেই মনে রাখাই কষ্টকর। কিন্তু ভদ্রলোক এতই ভদ্র ও অমায়িক ছিলেন যার ফলে আজও তাঁর নাম মনে করতে পারছি। খেতে খেতে অনেক মজার গল্প হোল। পরিবেশটা খুবই ভাল লাগলো। মার্কের কিন্তু এখানেও অবসর নেই, সে সমানে ছবি তুলছে। অনেক গল্প গুজবের ভিতর দিয়ে ডিনার পর্ব শেষ হোল। একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

বেশ পরিবর্তন করবার আগে ডাইরীর পাতা খুলে বসলাম কিছু লেখবার জন্য। দু'ছত্র লিখতে না-লিখতেই দরজায় করাঘাতের শব্দ হোল। দরজা খুলতেই নজরে পড়লো মারিয়া ও মার্ককে। দরজায় দাঁড়িয়ে মিঃ ইরাকৃলি। মারিয়া জানালো যে মিঃ ইরাকৃলি প্রস্তাব করছেন এখন এখানকার বিখ্যাত ফুনি ফ্লোর দেখবার জন্য। কারণ তাদের হিসাবমত রাত্র এখন বেশী হয়নি আর 'ফুনি ফ্লোর' ভ্রমণের জন্য রাত্রিটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমার ঘরের জানালা দিয়ে ফুনি ফ্লোরের চূড়া দেখা যায়। অপূর্ব সে দৃশ্য—তাই আমি আনন্দে রাজী হয়ে গেলাম। পাঁচমিনিটে তৈরী হয়ে নিলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা গন্তব্য-স্থানে পৌছালাম। গাড়ী থেকে নামতেই শীতের প্রকোপে মনে হোল হাত-পা ও নাকের ডগা জমে পাথর হয়ে যাচ্ছে। যদিও গরম কাপড় যথেষ্ট ছিল তবুও দারুণ বাতাসে সেই কাপড় পর্যাপ্ত

মনে হচ্ছিল না। গাড়ী থেকে নেমে হোটেলে যেতে যেটুকু সময় লাগলো তাতেই ওখানকার শীত সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। পাহাড়ের চূড়ায় আধুনিক হোটেল আর সম্মুখে সুন্দর বাগান। এই পাহাড়ে ভ্রমণ করবার জন্য সুড়ঙ্গ পথে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলাচল করে। অবশ্য মোটরের রাস্তাও আছে, আর এই পথেই আমরা এসেছি। মিঃ ইরাকৃলি কফি খাওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমার যে খুব অনিচ্ছা ছিল তা নয় তবুও আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু আমার কোন আপত্তি টিকৃলো না। হোটেলটির খাবার ঘরের একধারে কতকগুলো যুবক গীটারের সাহায্যে গান করছিল। অবশ্য তারা গানের চেয়ে হৈ হুল্লোড়ই বেশী করছিল। কফির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো চকলেটের প্যাকেটও এসে গেলো। ফেরার সময় সে গুলো উপহার স্বরূপ আমাকে গ্রহণ করতে হোল। খুব হাসি পাচ্ছিল আমার। ছোট ছেলেমেয়েদের মত চকলেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে চলেছি আমি আর মারিয়া গ্রিজুনোভা।

রেস্তোরাঁর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে গোটা শহরটাই দেখা যাচ্ছে। আলোক-মালায় সজ্জিত বিলিসী শহরটাকে তখন অপরূপ রূপসী বলে মনে হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শহরের এই মোহময়ী রূপকে দেখছিলাম, কিন্তু প্রচণ্ড শীতের দরুণ এ সৌন্দর্য বেশীক্ষণ উপভোগ করা সম্ভব হোল না। ফিরে এলাম নিজেদের আস্তানায় অর্থাৎ বিলিসী হোটেলে। তখন রাত হয়েছে অনেক, ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর অতিক্রম করে যাচ্ছে। হোটেলে ফিরেই শুয়ে পড়লাম। নিদ্রার জন্য আরাধনা করতে হোল না, কোন পথে নিদ্রা দেবী এলো টেরই পেলাম না।

চিরদিনের মতই খুব সকালে ঘুম ভাঙলো। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি, ভাবলাম আর একটু ঘুমিয়ে নিই, কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। প্রায় আধ-ঘন্টা চোখ বুজে পড়ে থাকবার পরও যখন নিদ্রাদেবীর পুনরাগমনের কোন সম্ভাবনা দেখা গেলনা তখন বাধ্য

Scanned with CamScanner

হয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে হোল। গরম পানির তো কোন অভাব নেই, কল ঘোরালেই ঝর্ ঝর্ করে গরম পানি ঝরতে থাকে। তাই গোসলটা সেরে নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সকাল বেলার স্নিগ্ধ বাতাস ও মৃদু রোদে ঘর ভরে আছে। মনটা আপনা থেকেই আনন্দে ছেয়ে গেল। মনে হোল, আজকের এই স্নিগ্ধ সকাল যেন বয়ে এনেছে আনন্দ বার্তা, জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ।

গতকাল হোটেলের পোষ্টাফিস থেকে কতকগুলো ছবির পোষ্টকার্ড কিনেছিলাম। সেইগুলোর সদ্ব্যবহার করার কথা মনে জাগলো। কয়েকটা কার্ড লিখে ফেললাম দেশে ছেলেমেয়ের কাছে ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের কাছে। চিঠি লেখা শেষ করে তৈরী হয়ে নিলাম—আজ যাব বহুদূরে একটিগ্রাম দেখতে। এখান থেকে গ্রামটির দূরত্ব হচ্ছে প্রায় দেড়শো মাইল, সুতরাং আমাদের সকালেই রওয়ানা হতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারিয়া ও মার্ক তৈরী হয়ে এলো। মারিয়া তাগাদা দিল আজকে আয়েস করে খাওয়া চলবে না, তাহলে রওয়ানা হতে দেরী হয়ে যাবে।

বিলিসীর অধিকাংশ লোকই সকালে ব্রেকফাষ্টে 'মাৎসোনী' খায়। শুনে আমার শখ্ হোল জিনিষটা কি দেখবার। মাৎসোনী আনা হোল,—ওমা—এযে দৈ। মাথা নেড়ে মারিয়া জানালো, না—এ-দইনা, আমরা একেই মাৎসোনী বলি। আমাদের দেশে সকালবেলা এ ভাবে দই খাবার নিয়ম না থাকলেও এখানে কিন্তু এ জিনিষ খেতে মন্দ লাগলো না। বেয়ারা একটা প্লেটে পাতাওয়ালা কিছু মূলো রেখে গেল। আমিতো দেখে অবাক! সকাল বেলা পাতাওয়ালা মূলো কি হবে। শুনলাম এ-জিনিষও এখানকার উপাদেয় খাদ্য এবং ব্রেকফাষ্টেই বিশেষভাবে খাওয়া হয়ে থাকে। মার্ক মহানন্দে নূন মেখে সবগুলো মূলোর পাতা খেয়ে ফেললো। আমি হেসে বললাম যে আমাদের দেশে এইভাবে কাঁচা পাতা

খায় ছাগল নামীয় জীব। মার্ক আমার কথাটা খুব উপভোগ করলো।

সাড়ে নয়টায় আমরা রওয়ানা হলাম দেড়শো মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম তেলাভী পরিদর্শন করতে। আমাদের সঙ্গে মারো নাম্নী স্থানীয় মহিলা-কর্ম্মী পথ দেখিয়ে চললেন। কখনও পাহাড়ের ভিতর দিয়ে কখনও গ্রামের ভিতর দিয়ে আবার কখনও জনবিরল মাঠ পেরিয়ে চললো আমাদের গাড়ী। পাহাড়ের পর পাহাড় পাড় হয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে ঘণ্টায় ষাটমাইল বেগে। আবার কখনও সাবধানতার জন্য মাইলের কাঁটা নেমে আসছে বিশের ঘরে। দূরে দেখা যাচ্ছে এক পাহাড়ের গা ঘেঁষে আরেক পাহাড়, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা—এমনি অজস্র পাহাড়ের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। অধিকাংশ পাহাড়ের চূড়াই বরফে ঢাকা। মাথার উপর মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের পরশ পেয়ে মনটা আজকে অকারণেই খুশীতে ভরে আছে। আজ সবই সুন্দর লাগছে, সবই মধুর, অপূর্ব।

গ্রামের পর গ্রাম পাড় হয়ে চলেছি। একটি গ্রামের সঙ্গে আরেকটি গ্রামের কোন প্রভেদ নেই। গ্রামবাসীর বেশভূষার সঙ্গেও বাহ্যতঃ কোন প্রভেদ নজরে পড়লো না। অধিকাংশ বাড়ী ঘরই পাকা তবে আকারে বিশেষ বড় নয়। ছোট ছোট পাকা-বাড়ী, মাঝে মাঝে সুন্দর ফলের গাছ। দু'একটা ছাগলও নজরে পড়লো। একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা গাড়ী চলার পর তেলাভীর মাইল সাতেক আগে একটি সুন্দর বাগানে এসে আমাদের গাড়ী থামলো। এই বাগানের একধারে একটি মদের কারখানা আছে। এই কারখানাটির নাম সিনানদালী ওয়াইন ওয়ার্কস। সিনানদালী ওয়াইন ওয়ার্কস-এর ডাইরেক্টার আমাদের সাদর আহ্বান জানিয়ে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বলাবাহুল্য, বাড়ীটা পার্কের ভেতরেই। এরপর স্বামী স্ত্রী উভয়েই আমাদের খাতির করতে লেগে গেলেন।

Scanned with CamScanner

গরম চা খেয়ে মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো। একটানা তিনঘণ্টা মোটর ভ্রমণ করে এসে স্বভাবতঃই একটু চা খাওয়ার জন্য প্রাণটা আকুলি বিকুলি করছিল। চা-পর্ব শেষ হবার পর ভদ্রলোক তাঁর কারখানা পরিদর্শনের আহ্বান জানালেন। কিন্তু আমি তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। কারণ বাইরে বাতাসের সঙ্গে যে দুর্গন্ধ ভেসে আসছিলো সেটাই সহ্য করা কঠিন মনে হচ্ছিল বার বার। এরপর ভিতরে গিয়ে যে দাঁড়াতে পারবো না, গা গুলিয়ে উঠ্‌বে, সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। আমার আপত্তির কারণ বুঝিয়ে বলাতে ভদ্রলোক আর পীড়াপীড়ি না করে আমাদের তাঁর শোরুম দেখাতে নিয়ে চললেন।

বাগানের ভেতরেই একটি বড় অট্টালিকাতে এই শোরুম করা হয়েছে এবং এখানে কোম্পানীর বোর্ড অফ-ডাইরেকটার্সদের মিটিং হয়। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল পাতা আছে, তার দু'পাশে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক চেয়ার লাগানো। ঘরের দু'ধারের দেয়ালের তাকে নানা আকারের ও নানা ধরণের মদের বোতল সাজানো রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি বোতলের গঠনাকৃতি অদ্ভুত। আবার অনেকগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। এর দোতালার ঘর গুলিকে মিউজিয়াম বানানো হয়েছে। অতীত কালের স্থানীয় খ্যাতিমান ব্যক্তিদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও তাঁদের চিত্র এখানে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে বহু প্রাচীন কালের দ্রব্যাদিও আছে। এ জিনিষগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দরুণই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই-সব দেখে আমরা নিচে বাগানে নেমে আসতেই দু'টো গাড়ী এসে থামলো আমাদের সম্মুখে। গাড়ী থেকে নেমে কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। এর মধ্যে একজন মহিলা স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদিকা। ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে করমর্দন করলেন। একজন যুবকও এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন। পরিচয়ে জানলাম ইনিই এখানকার অর্থাৎ তেলাভী গ্রামের কর্তা। এঁরা সবাই

আমাদের এগিয়ে দিয়ে যাবার জন্য এসেছেন। আলাপ পরিচয়ের পর্ব শেষ করে সিনান্দালীর ডাইরেক্টারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে বসতে যাচ্ছি এমন সময় হৈ-হৈ করে একদল পুরুষ ও মহিলা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমিতো খানিকটা ঘাবড়েই গেলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম মারিয়ার দিকে। মারিয়া শুনে নিয়ে বললো, এরা সব সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্নস্থান থেকে টুরিষ্ট হিসাবে এসেছে। শাড়ী পরিহিতা মহিলা তাদের নিকটে রীতিমত দর্শনীয় বস্তু, তাই আমার সঙ্গে তারা একটা ছবি তুলতে চায়। তাদের ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে গিয়ে বসলাম বাগানের বেঞ্চিতে। ওরা সকলে আমার সম্মুখে ও পিছনে যে যতটা পারলো ঘনিয়ে বসলো। ছবি তোলা শেষ হলে তাদের আনন্দ দেখে কে। পৃথিবীতে এমনিতর কত ছোটখাট ব্যাপার থেকেই না মানুষ আনন্দ পেয়ে থাকে। আমার সঙ্গে সামান্য একটা ছবি তুলতে পেরেই তারা যে আনন্দ পেল তার পরিমাপ করা কঠিন।

এখান থেকে মাইল তিনেক এগিয়ে গিয়ে একটি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে আমাদের গাড়ী থাম্‌লো। এখানে বহুলোকের ভিড়, ব্যাপার কিছু আন্দাজ করতে পারলাম না। মারিয়াও ঠিক আমারই মত আশ্চর্যান্বিতা হয়েছে বোঝা গেল। গাড়ী থেকে নামতেই কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ফুলের মালা ও তোড়া দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। মারিয়া এতক্ষণ ধরে ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলো, এইবার আমার কাছে এগিয়ে এসে জানালো, এখানকার বিখ্যাত কবি সোটা রুস্তাভেলীর জন্মদিবস উৎসব পালন করা হচ্ছে আজ এখানে। ভিড়ের চাপে এগোতে পারছিনা, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। আমি অতিথি বুঝতে পারামাত্র তারাই পথ করে দিল। আমাকে নিয়ে বসানো হোল রুস্তাভেলীর ব্রোঞ্জমূর্তির পাশে নবনির্মিত মঞ্চে। উপস্থিত জনতা আমাকে ফুলের তোড়া উপহার দেবার জন্য ব্যগ্র। অধিকাংশই বালক-বালিকা

Scanned with CamScanner

তারা আমাকে মালা ও তোড়া দেবার জন্য ভিড় করতে লাগলো। আমি চেয়ারে বসতেই এদের কার্যসূচী আরম্ভ হোল। এতক্ষণ আমারই প্রতীক্ষায় ছিলেন এঁরা অথচ আমরা এ প্রোগ্রামের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অনেকগুলো স্কুলের ছাত্রছাত্রী কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করলো। বলাবাহুল্য, এর কোনটাই আমার বোধগম্য হোল না। মারিয়াকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে সেও বুঝতে পারছে না এদের ভাষা, কারণ এরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলছে। তবে সবাই যে সেই কবির স্মৃতিতে স্তুতি গাইছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এখানকার সভা শেষ হবার পর আবার সবাই মোটর যোগে সোটা রুস্তাভেলীর কবর দেখতে চললেন। এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটি নির্জন পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে অতি পুরাতন একটি গির্জা। এই গির্জার অভ্যন্তরে কবির সমাধি রয়েছে।

তেলাভী গ্রামে যখন পৌছালাম তখন বেলা তিনটা বাজে। গ্রামটি খুবই বর্ধিষ্ণু। এখানে পুরানো আমলের একটি দুর্গ বা ফোর্ট আছে। একটি যাদুঘরও আছে। মারিয়া প্রস্তাব করলো, প্রথমে সংক্ষিপ্ত লাঞ্চ খেয়ে তারপর গ্রামটি প্রদক্ষিণে বের হতে। রাত্রে আবার আমার আগমন উপলক্ষে স্থানীয় টাউনহলে সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। মারিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী সম্পাদিকা ভদ্রমহিলা আমাদের একটি বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এখানে কেক্, পনির ও কিছু ফলমূল সহ চা পান করে আমরা গ্রাম প্রদক্ষিণে বের হলাম। গোটা গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। আমাদের দেশের ছোট খাট শহর বলে মনে হোল। যাদুঘরে নূতনত্ব কিছু নেই, অন্যান্য যাদুঘরের মতই প্রাচীন চিত্র ও কিছু মূল্যবান বাসনপত্র এখানেও সাজানো আছে। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, সামান্য একটা গ্রামেও যাদুঘর স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের সংগ্রহও নিতান্ত ফেলে দেবার মত নয়। ঘুরে ফিরে দেখতে প্রায় আড়াই

ঘন্টা গেল। মারিয়া তাড়া দিতে লাগলো ভোজ সভায় যাবার জন্য, কারণ তাড়াতাড়ি ভোজনপর্ব সমাধা করে আমাদের আবার রওয়ানা হতে হবে তিবলিসীর দিকে।

সাড়ে ছ'টায় আমরা পৌছালাম টাউনহলে। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে। হলে ঢুকে দেখি সেখানে ইতিমধ্যে বহুলোক সমবেত হয়েছে। সম্পাদিকা একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এরা সবাই এখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে প্রায় জনা তিরিশেক। বড় লম্বা টেবিলের দু'পাশে সবাই বসলেন, শুরু হলো ভোজন পর্ব। নানারকম খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগলো ভেড়ার গোস্তের টিকিয়া কাবাব। ভোজের আসরে কয়েকজন যুবকও ছিলেন। তাঁরা গীটার সহযোগে গান শুরু করলেন। গানের সুর কানে যেতেই খাওয়া বাদ দিয়ে কয়েকজন উঠে গিয়ে নাচ শুরু করলেন। এদের দেশের নাচের রীতি হচ্ছে প্রথমে পুরুষ উঠে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করে, তারপর নাচতে নাচতেই সে তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন মহিলার পাশে এসে দাঁড়ায়। তখন সেই মহিলাকে অবশ্যি নাচে অংশগ্রহণ করতে হবে। এবার চলে দ্বৈত নৃত্য। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ঘুরে ঘুরে নেচে চলে। আমার সঙ্গিনী মারোকে প্রথমে নাচতে যেতে হোল, তারপর মারিয়াও বাধ্য হোল নাচতে। আমি বেশ উপভোগ করছিলাম তাদের এই নাচ। ওদিকে নাচের সঙ্গে সঙ্গে গীটারের বাজনা ও গান চলছে।

এই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হঠাৎ নাচতে নাচতে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। আমি লজ্জিতভাবে তাদেরকে জানালাম যে আমি নাচতে জানিনা—কিন্তু কে কার কথা শোনে? মারিয়া এবং মারো দু'জনে মিলে দুদিক থেকে ঠেলে আমাকে তুলে দিল চেয়ার থেকে। আমি যেন অথৈ পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে তাদেরকে বললাম যে আমি নাচের

Scanned with CamScanner

কিছুই জানি না। কিন্তু আমার কথা তাদের কানেই ঢুকলো না। আমাকে নাচানোর জন্য তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। মহা বিপদে পড়লাম। মনে ভাবলাম, কেন মরতে এই গ্রামে এসেছিলাম? এখন এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাই কি করে? পীড়াপীড়ি চলছে, নাচতেই হবে। অগত্যা আমি তাদেরকে জানালাম যে আমি প্রলয় নৃত্য দেখাতে পারি—অর্থাৎ হাত-পা ছুঁড়ে নাচের প্রহসন করতে পারি। তারা নাছোড়বান্দা সুতরাং আমার এই প্রস্তাবেই তারা রাজী। মনে মনে তখন প্রার্থনা করছি, 'ধরণী দ্বিধা হও'। কিছুতেই তারা বুঝবেন না। কি করে মুস্কিল আসান হবে ভেবে আমি কূলকিনারা পাচ্ছি না। অগত্যা তাদের হাত এড়ানোর জন্য কোনরকমে হাত-পা ছুঁড়ে একটু নাচের ভঙ্গী করেই দৌড়ে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়লাম। এরপর আরও বেশ কিছুক্ষণ নাচ-গান ও হাসি তামাসা চলতে লাগলো। এবার আমাদের বিদায়ের পালা। অনেক দূরের পথে পাড়ি জমাতে হবে; ফিরে যেতে হবে বিলিসীতে।

বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের অনেকেই আমাদের গাড়ীর পিছনে আসতে লাগলেন। মাইল খানেক আসবার পর আবার গাড়ী থামাতে হোল। ভোজ সভায় উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে একজনের বাড়ী এখানে। তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন দু'মিনিটের জন্য তাঁর বাড়ীতে বসে যেতে। এত আন্তরিকতা ছিল তাঁর এই আমন্ত্রণের পিছনে যে দেরী হয়ে যাচ্ছে জেনেও তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। ভদ্রলোকের স্ত্রী তাড়াতাড়ি কিছু ফলমূল নিয়ে এলেন। এইবার প্রবল আপত্তি জানালাম। এইমাত্র খেয়ে আসছি, এখন আর কোনকিছু খাবার কোন উপায়ই নেই। অবশেষে ভদ্রমহিলা মিষ্টিগুলো একটা কাগজে জড়িয়ে প্যাকেট করলেন, বললেন তাঁর নিজের হাতের তৈরী মিষ্টি। হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলাম তাঁর এই আন্তরিক

উপহার। মিষ্টিগুলো দেখতে আমাদের দেশের তেঁতুলের মত। তবে আকারে অনেক বড় এবং খেতেও খুব মিষ্টি। তেঁতুল তো গাছের ফল আর এ হলো নানা উপকরণে তৈরী মিষ্টি। এই মিষ্টি এদের জাতীয় খাবার, আমাদের যেমন সেমাই। উৎসবে পাল-পার্বণে এই মিষ্টির প্রচলন এদের সর্বত্র।

আর দেরী করা সম্ভব নয়। সবার কাছথেকে আবার বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম। এবারও তাঁরা সবাই আমাদের পিছন পিছন গাড়ী করে আসতে লাগলেন। শহর এলাকা ছাড়িয়ে আসবার পর তারা বিদায় গ্রহণ করলেন। বার বার অনুরোধ জানালেন আবার আসতে, বললেন বিদায় দিতে নাকি তাদের ইচ্ছে হচ্ছে না। তাঁদের এই আন্তরিকতা আমাকে বার বার মুগ্ধ করেছে, অভিভূত করেছে। তাঁদের স্মৃতি চিরজাগরূক হয়ে অঙ্কিত রইল আমার হৃদয়ের মণিকোঠায়। রাত একটায় পৌছালাম হোটেলে। পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত কিন্তু মন ভরা আনন্দে।

আজ ২৫শে নভেম্বর। ৩'১৫ মিনিটের সময় আমাদের প্লেন ছাড়বে তাসখন্দের উদ্দেশ্যে। বেলা ১০ টায় ইনা ও নীনা এসে পৌছালো। তারা প্রস্তাব জানালো একটি বাগান দেখতে যাবার জন্য। হাতে যথেষ্ট সময় আছে বলে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবেই তাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম। শহর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে পুরাতন শহরে অবস্থিত এই বাগানটি।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছে গেলাম। ম্যাডাম নীনা আমাকে জানালেন যে এই বাগানটির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এখানকার ৯৩ বৎসর বয়স্ক প্রাচীন কবির স্বহস্তে রচিত এই বাগানটি। আমরা যখন পৌছালাম তখন টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই একটা কুকুর সাড়া দিয়ে উঠলো। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া দেহ নিয়ে এক বৃদ্ধ কোদাল হাতে এসে দাঁড়ালেন আমাদের সম্মুখে।

বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার
বর্ধমান হাউস, ঢাকা-২

অবাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এলো। ইনিই বৃদ্ধ কবি মিখাইল মুলা রোমভিলা। যাঁর পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন, তিনি নিজ হাতে কোদাল নিয়ে বাগানের পরিচর্যা করছেন। এটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো। ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, অথচ আড়াই বিঘে জমির উপর এই বাগানের সবটাই তাঁর স্বহস্তে রচিত। শীত বৃষ্টি বাদল সবকিছুকে উপেক্ষা করে বৃদ্ধ কিভাবে প্রাণপ্রিয় বাগানের পরিচর্যা করছেন সেটা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয়। বিশ্রামকে ত্যাগ করে নিদ্রাকে আমল না দিয়ে অহঃরহঃ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাগানের আনাচে কানাচে।

আমাদের বাগানে পৌছানোর আগে থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই আমরা গোটা বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কি অপূর্ব সংগ্রহ এই বৃদ্ধের। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন একটি ঢাকা ঘরে। এখানে আছে নানাজাতের অর্কিডের সংগ্রহ। বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে গাছের ডালে বা পাথরের বেদীতে ছোট ছোট ফুলের সাজি ঝুলছে। এইসব সাজিতে আবার লতাপাতা ও ফুল দিয়ে তৈরী করা হয়েছে কৃত্রিম বাগান। অদ্ভুত লাগছে সব কিছু। এই সাজি, কৃত্রিম বাগান, সবই এই বৃদ্ধের নিজের হাতে তৈরী। বাগানের পাশেই ছোট একটা ঘরে তিনি থাকেন। কিন্তু নিজের ঘরে সময় তার খুব কমই কাটে। ঘরে বসে থাকতে তাঁর মন চায় না, তাই বাগানে খুট খুট করেন।

বাগান দেখানো শেষ করে কবি মিখাইল মুলা রোমভিলা আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। বাগানের এক ধারে তিন কামরা একটা ছোট বাড়ী আছে তাঁর। প্রথম কামরাটিতে নানারকম শুকনো ডাল-পালা ও দড়ি রাখা আছে। এই ঘরে বসে ঐগুলোর সাহায্যে তিনি বাগানের জন্য ছোট ছোট ফুলের সাজি তৈরী করেন স্বহস্তে।

দ্বিতীয় ঘরটিতে আছে নানারকম নুড়ি পাথর ও স্ফটিকের সংগ্রহ। এর মধ্যে কতকগুলো সংগ্রহ খুবই মূল্যবান বলে মনে হোল। তৃতীয় ঘরটিতে টেবিলের উপর অনেকগুলো এ্যালবাম রাখা আছে দেখলাম। ভদ্রলোক নিজেই এগিয়ে গিয়ে ঐ এ্যালবামগুলো খুলে আমাদের দেখাতে লাগলেন। এ্যালবামের প্রত্যেকটি পাতায় সুন্দর সুন্দর পাতা ও ফুল আঠা দিয়ে এঁটে রাখা হয়েছে। ঐ ফুলগুলো এবং পাতাগুলো যে শুকিয়ে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে তাদের সৌন্দর্যের সামান্যতম হানি ঘটেনি। এ ছাড়া ঘরের দেয়ালের চারদিকেও নানারকম ফুল ও পাতার ছবি টাঙ্গানো আছে। ঐ সঙ্গে তাঁর আত্মীয় পরিজনদের এবং তাঁর নিজের ছবিও টাঙ্গানো আছে। নানারকম সুন্দর পাতা বসিয়ে ভদ্রলোক কতকগুলো ক্রীস্‌মাস কার্ডও তৈরী করেছেন। কার্ডগুলো সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। সমস্ত দেখে শুনে মনে মনে অশেষ শ্রদ্ধা জানালাম বৃদ্ধকে। সত্যিই ইনি অদ্ভুত। তিরানব্বই বৎসর বয়সে নাতি নাত্‌নীদের ঘিরে ড্রয়িং রুমে বসে আরাম আয়েস করে গালগল্পে যার সময় কাটানোর কথা, তিনিই আজ আরাম আয়েস বিস্মৃত হয়ে কি পরিশ্রমটাই না করছেন। কি অপূর্ব এক জগতের সৃষ্টি করেছেন তিনি। সারা পৃথিবীর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সম্মুখে এক নজির তুলে ধরলেন তিনি যে, মানুষ ইচ্ছা করলে সব সময়েই নিজেকে কাজে নিয়োগ করতে পারে। বয়সের দোহাই দিয়ে অলস ভাবে জীবন কাটানোটা হচ্ছে নেহাৎই একটা অজুহাত মাত্র। বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক একখানি খাতা এগিয়ে ধরলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় বাগানটি সম্পর্কে আমার অভিমত লিখে দেবার জন্য। পাতা উল্টে দেখি বিশ্বের নানাস্থান থেকে পর্য্যটকরা এসে অভিমত লিখে রেখে গিয়েছেন এই খাতার পাতায়। নানা ভাষায় নানান্ ছাঁদে লেখা আছে তাঁদের অভিমত। আমিও আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম খাতার পাতায়, কালির আঁচরে। আমি তো সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি, অভিভূত

হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি তাঁর শিল্পানুরাগ দেখে, তাঁর কর্মক্ষমতা দেখে।

ফেরার পথে আমার সঙ্গিনীর নির্দেশ ক্রমে গাড়ী এসে থামলো এক অতি প্রাচীন গির্জার কাছে। পুরাতন যুগের সামগ্রী সংগ্রহের আশায় এই গির্জার চারপাশে এখন খনন্ কার্য চলছে। অনেক মূল্যবান পাথর এবং বাসনকোশন নাকি পাওয়া গিয়েছে এখান থেকে। তাই খনন্ কার্য এখনও অব্যাহত আছে।

বৃষ্টি পড়ছে সমানে। তবুও দেখবার স্পৃহা আমার অদম্য। মনের কাছ থেকে বার বার তাগিদ—যা কিছু পার দেখে নাও, এমন সুযোগ হাতছাড়া করোনা। তাই তো চোখ মেলে দেখছি, কানপেতে শুনছি। কিন্তু কতটুকু আর পেয়েছি আর কতটুকুই বা জানতে পেরেছি। ঐ যে গির্জার অভ্যন্তরে দেয়ালের সারা গায় যে প্রাচীন চিত্রগুলো অঙ্কিত রয়েছে, সেগুলো কোন যুগে কোন শিল্পী এঁকেছিলেন সেকথা তো আজ কেউ বলতে পারছে না। সেই নাম-না-জানা শিল্পী কোন রংয়ের সাহায্যে কিসের তুলির সাহায্যে না-জানি এই চিত্রগুলো এঁকেছিলেন যার ফলে এতযুগ পর আজও ঐগুলো অম্লান রয়েছে, রংয়ের ঔজ্জল্যে ঝক্‌ঝক্ করছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে এই ধরণের প্রাচীন গির্জাগুলোর দেয়ালে যে কত অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত আছে তার হিসাব করা কঠিন। যেখানেই গিয়েছি গির্জার ছড়াছড়ি দেখতে পেয়েছি। অতীতের গৌরব ও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই গির্জাগুলো।

বেলা একটায় ফিরে এলাম হোটেলে। এবার জর্জিয়া প্রদেশ-থেকে বিদায় নেবার ক্ষণ এগিয়ে এলো। পৌণে তিনটায় বিলিসী বিমান বন্দরে পৌছালাম। প্রচণ্ড শীত ও সেই সঙ্গে কন্‌-কনে ঠাণ্ডা বাতাস। মোটর-গাড়ী থেকে নেমে ঠাণ্ডা বাতাস ঠেলে বিমান বন্দরের ঘরে প্রবেশ করার সময়টুকুর মধ্যেই মনে হোল, যেনো হাত-পা জমে বরফ হয়ে গেল। কোন রকমে ঘরে প্রবেশ করে হাঁফ

ছেড়ে বাঁচলাম। ইনা ও ম্যাডাম নীনা আমাদের পূর্বেই ওখানে পৌছে গিয়েছেন দেখলাম। আরও বিশ মিনিট পর আমাদের প্লেন ছাড়বে। মার্ক প্রস্তাব করলো, চলো তোমাকে বিমান বন্দরের দোকানগুলো দেখিয়ে আনি। আমারও মনে পড়লো, সত্যিই তো এখানে কিছু কেনা হয়নি। প্রত্যেক স্থান থেকেই কিছু-না-কিছু জিনিষ কিনেছি নিদর্শন স্বরূপ রাখবার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে তেমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নজরে পড়লো না। ম্যাডাম নীনা বিলিসীর মূর্তি আঁকা ব্রোঞ্জের লকেট উপহার দিলেন আমার কন্যার জন্য। ছোটখাট আরও দু'চারটে জিনিষ কিনে নিলাম। ইতিমধ্যে বিমানে আরোহণ করবার জন্য আহ্বান জানানো হোল। ম্যাডাম নীনা ও ইনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বিমানে আরোহণ করলাম।

বিমানটি আকাশে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈমানিক জানালেন, তাসখন্দে আমাদের পৌছতে মোট সময় লাগবে দু' ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট। মস্কো থেকে বিলিসীর সময়ের ব্যবধান হচ্ছে দু'ঘণ্টার আর তাসখন্দের সঙ্গে সময়ের ব্যবধান তিন ঘণ্টার। অর্থাৎ বিলিসীর সঙ্গে তাসখন্দের সময়ের ব্যবধান হচ্ছে একঘণ্টার মাত্র। ঠিক এমনি সময়ের ব্যবধান আছে আমাদের পূর্বপাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের।

আমরা যখন তাসখন্দে পৌছলাম তখন রীতিমত রাত বলতে হবে। বিমান বন্দরে খালেদা ও লুজমিলা নাম্নী দু'জন মহিলা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। খালেদা স্থানীয় মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা আর লুজমিলা মিত্র সংস্থার একজন কর্মী।

এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে, প্রবল বৃষ্টি। আমি যেখানেই যাচ্ছি বৃষ্টি যেন আমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছে। বৃষ্টির হাত থেকে কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে মোটরে এসে বসলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাসখন্দের বিখ্যাত হোটেল তাসখন্দে পৌছালাম। সোভিয়েট

Scanned with CamScanner

ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেকটি বড় শহরের নামানুযায়ী সাধারণতঃ শহরের প্রধান হোটেলের নামকরণ হয়ে থাকে। আমাদেরকে হোটেলের কামরায় পৌঁছে দিয়ে এবং আমার সঙ্গিনী মারিয়াকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে খালেদা ও লুদ্মিলা বিদায় নিলেন। আগামী কাল সকাল ন'টায় আবার তাঁরা উপস্থিত হবেন জানিয়ে গেলেন।

একঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার খেতে যেতে হবে জানালো মারিয়া। যথা আজ্ঞা বলে দরজা বন্ধ করলাম। এই কয়েক দিনেই মারিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে ঘরের দরজায় টোকা পড়লো। মারিয়া তৈরী হয়ে আমাকে নিতে এসেছে খেতে যাবার জন্য। লম্বা করিডোর পার হয়ে লাউঞ্জের এককোণে লিফ্‌টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লাউঞ্জে টেলিভিশন চলছে, বহু শ্রোতার বা দর্শকের ভীড় সেখানে। আমার শাড়ীর দিকে এবার সকল দর্শকের দৃষ্টি পড়লো।

ডাইনিং রুমটি অর্থাৎ তাদের খাবারঘর একতলায়। লম্বা ঘর, মাঝখানে উঁচু বেদীতে বাজনা চলছে। ছোট ছোট টেবিল ঘিরে বহু লোক বসে আছে। এই হল ঘরের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে বসানো হোল। এই ঘরে একটি টেবিলে কয়েকজন লোক বসেছিলেন, দেখে বাঙালী বলে মনে হোল। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন "Are you an Indian ? (আপনি কি ভারতীয় ?) "No, I am a Pakistani (না, আমি পাকিস্তানী) মনে হোল আমার উত্তর শুনে তাঁরা হতাশ হলেন। এরপর আলাপ এগিয়ে চললো। জানতে পারলাম তাঁরা সবাই ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক, এসেছেন ডেলিগেশানে। বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে তাসখন্দ সরকারের কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করবার জন্য এখানে তাঁদের আগমন। তাঁদের

মধ্যে একজন বেশ তৎপরতার সঙ্গে আমাকে উপদেশ দিলেন, তাসখন্দে যখন এসেছেন তখন সমরকন্দ ও বোখারায় অবশ্যই যাবেন, কারণ সমরকন্দ ও বোখারায় ভারতীয় সংস্কৃতির ছড়াছড়ি দেখতে পাবেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি আর রাগ চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম, "মাফ করবেন, সমরকন্দ ও বোখারায় যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাকে ভারতীয় সংস্কৃতি মনে করে গর্ব বোধ করবার কিছু নেই, আসলে সেটা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি। দিল্লী ও আগ্রায় মোগল বাদশাহদের আমলের স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে সমরকন্দ ও বোখারার স্থাপত্য শিল্পের যে মিল দেখা যায় তার আসল কারণ মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব।"

আমার উত্তর শুনে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে নিজের টেবিলে বসলাম।

এরপর আরও কয়েকবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু তাঁরা আর কথা বলবার চেষ্টা করেননি। হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলাটা বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেননি।

আজ ২৬শে নবেম্বর, তাসখন্দে আমার প্রথম প্রভাত। ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ে গেলো, আমার সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ২৯শে তারিখে আমি মস্কো ত্যাগ করবো লণ্ডনের উদ্দেশ্যে। শয্যা ত্যাগ করে তৈরী হয়ে নিলাম। আমার ঘরটার সম্মুখে এক ফালি বারান্দা আছে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগলো, মনে হলো প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস আমাকে অভিনন্দন জানালো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এখানকার প্রভাত কালের পরিবেশটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম। খুব শীত, তবে মস্কো, লেলিনগ্রাড বা বিলিসীর মত শীত নয়। তবুও বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, শীতের কাঁপুনি লাগে।

হোটেলের সম্মুখেই সরকারী পার্ক। ভারী সুন্দর ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে পার্কটি। মাঝখানে মস্ত বড় ফোয়ারা। ফোয়ারা দিয়ে ঝির ঝির করে পানি ঝরে পড়ছে অনবরত। পার্কের ওপাশে হোটেলের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তাসখন্দ থিয়েটার। তাসখন্দ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাথরের দেশ অর্থাৎ City of Stones এই প্রদেশের জনসংখ্যা হচ্ছে ৯,৩৬,০০০। বর্তমানে তাসখন্দে সতেরোটা কলেজ ও ১৫৩টা স্কুল আছে। এই বিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১,২৫,০০০। বলাবাহুল্য, তাসখন্দ হচ্ছে উজ্‌বেকিস্তানের রাজধানী।

তাসখন্দের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনেকটা আমাদের দেশের মত। তাই এখানে এলে নিজের দেশের কথা বেশী করে মনে পড়ে। মুসলিম সংস্কৃতির ছড়াছড়ি রয়েছে তাসখন্দের পথে-ঘাটে। কালরাত্রে হোটেলের বেয়ারা আমার জিনিসপত্র ঘরে পৌছে দিতে এসে আমাকে "আস্‌সালামো আলাইকুম" বলে সম্বোধন করলো। আমি উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। কারণ, রুশ দেশে এই প্রথম অতি পরিচিত আরবী শব্দ শুনলাম। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম যে বেয়ারাটি মুসলমান। আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে না পারলেও ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বললাম। পরে জেনেছিলাম তাসখন্দের শতকরা সত্তর জন অধিবাসীই মুসলমান।

ঘড়ির কাঁটা নটার ঘরে পৌছাতেই মার্ক গ্যানকীন এলেন আমাকে ডাকতে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি দেখে তাঁর ছবি তোলার সখ্ হোল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরথেকে ক্যামেরা এনে গোটা কয়েক স্ন্যাপশট্ নিয়ে নিলেন তিনি। ওঁর কাণ্ড দেখে হাসি পাচ্ছিল আমার। ক্যামেরা আর ছবি ওঁর অন্তপ্রাণ। এগুলো ছাড়া আর কিছু তিনি বোঝেন না। খুব হাসিখুশী লোকটি। সব সময় স্ফূর্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। মাঝে মাঝেই পকেট

থেকে একমাত্র ছেলের ছবিটা বের করে দেখান, "দেখতো আমার ছেলের ছবিটি কেমন দেখতে?" প্রশংসা শুনে খুশীতে ঝলমল করে উঠে তাঁর মুখ। আমার সঙ্গে তাঁর ব্যবহারটা মনে হয় যেন একজন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছোট বোনের বড় ভাই-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি। সব সময় সতর্ক দৃষ্টি আমার সুবিধা ও অসুবিধা ঘিরে। আমিও নির্বিচারে তাঁর এই ব্যবহারকে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। কারণ যাতে আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন রয়েছে তাকে তো অস্বীকার করলে নিজেকেই ঠকাতে হয়।

আমরা ব্রেকফাষ্ট করছি এমন সময় গতরাত্রের ভদ্র মহিলা দুজনা অর্থাৎ খালেদা ও লুজমিলা এসে উপস্থিত হলেন। মারিয়ার সঙ্গে বসে তাঁরা আমার প্রোগ্রাম তৈরী করতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা পরে মারিয়া বললো যে বেলা এগারোটায় আমরা যাব এখানকার বিখ্যাত নৃত্য ও গীত শিক্ষার বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে। সেখান থেকে সিরামিক কারখানা দেখা শেষ করে ফিরে আসবো। বিকেল বেলা অপেরা হাউসে অনুষ্ঠান দেখতে যেতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের কর্মসূচী।

যথাসময়ে আমরা পৌছলাম সেই নৃত্য ও গীত শিক্ষায়তনে। বিদ্যালয়ের প্রধান আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন। আলাপ আলোচনায় জানতে পারলাম, ইনি অতীতে একজন নামকরা ব্যালে নর্তকী ছিলেন। বয়সের দরুণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেদবৃদ্ধির ফলে আজকাল আর তিনি নৃত্যে অংশ নিতে পারেন না, তবে এই বিদ্যালয়ে তিনি নৃত্য শিক্ষা-দান করেন। এখানে ছেলে মেয়ে উভয়েরই নৃত্য গীত এবং অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রায় সমস্ত দিনটাই ছাত্র ছাত্রীদের এখানে কাটাতে হয়, তাই খাওয়ার ব্যবস্থাও এখানেই করা হয়।

আমাদেরকে নিয়ে প্রধান হল্‌ঘরে বসানো হলো। এই ঘরের দেয়ালে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের ছবি টাঙ্গানো আছে।

Scanned with CamScanner

ডাইরেকট্রেস ভদ্রমহিলা জানালেন যে ঐসব ছাত্র ছাত্রীর অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং ব্যালে নর্তক-নর্তকীরূপে তাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

আমরা সুস্থির হয়ে বসবার পর একদল কিশোর-কিশোরী এসে ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করতে লেগে গেল। বাজনার তালে তালে অদ্ভুত নিপুণতার ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা নেচে চলেছে। অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করলো এই কিশোর-কিশোরী দল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম এত অল্প বয়সে তারা এমন পারদর্শিতা লাভ করেছে দেখে। তাই তো ব্যালে নৃত্যের ক্ষেত্রে রুশ দেশ আজও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ আসন দখল করে আছে। কিশোর-কিশোরী দল বিদায় নেবার পর একজন তরুণ ও একটি তরুণী তাসখন্দের জাতীয় পোষাকে তাদের জাতীয় নৃত্য পরিবেশন করলো। এই নৃত্তের সঙ্গে আমাদের দেশের নৃত্যের খুব বেশী মিল আছে। তরুণীটির পরণে, লম্বা ঘাঘরার মত জামা, পিঠের উপর লম্বা বেনুনি ঝুলছে গোটাকয়েক। জিপসী নৃত্যের ঢংয়ে নাচ পরিবেশন করলো এরা। এরপর এক পাল শিক্ষার্থী এসে দাঁড়ালো দেয়াল ঘেঁসে। দেয়ালে লম্বা মোটা রড্ লাগানো আছে। এই রডের সঙ্গে ঝুলে কি করে তারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করে এবং ব্যালে নৃত্যের কঠিন মুদ্রাগুলি আয়ত্ব করে তাই দেখানো হোল। দেখেশুনে মনে হোল এগুলো একধরণের কঠিন পর্যায়ের ব্যায়াম। আসলে এগুলো হচ্ছে ব্যালে নর্তক- নর্তকীরূপে পারদর্শিতা লাভ করবার পূর্ব পর্যায়ের নৃত্য।

এই অনন্য ধরণের নৃত্যের জন্য যে বিশেষ প্রকারের জুতো ব্যবহৃত হয় সেই জুতোগুলো এনে আমাদেরে দেখানো হলো। এই সব জুতো দক্ষ কারিগর দ্বারা এখানেই তৈরী করানো হয়। একটা নৃত্যানুষ্ঠানের পর আবার নূতন জুতো ব্যবহার করতে

হয়, পুরাণো জুতো কাজে লাগে না। অবশ্য শিক্ষাকালে এক জোড়া জুতো দু'দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। এই জুতোর দাম প্রায় পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত। এখানে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে জুতো সরবরাহ করা হয়।

খাবার ঘন্টা বাজতে লাগলো আর আশেপাশের সব ঘরথেকে পিল্ পিল্ করে ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে খাবার ঘরের দিকে চললো। আমরাও সব ঘর পরিদর্শন করে খাবার ঘরে এসে ঢুকলাম। ছোট ছোট গোল টেবিল ঘিরে তিনচার জন করে বসে মহানন্দে খাচ্ছে। আমাদের দেশের পোলাও এদেশেও পোলাও বলে পরিচিত। পোলাও এদেরও খুব প্রিয় খাদ্য। বহুদিন পর নিজের দেশের খাবারের গন্ধ পেলাম। দেখাশোনা শেষ করে এসে ঢুকলাম প্রধান পরিচালিকার অফিস ঘরে। ঘরে ঢুকেই অবাক কাণ্ড নজরে পড়লো। ঘরের টেবিলে আমাদের আপ্যায়ণের জন্য নানারকম খাবার সাজানো, তার মধ্যে পোলাও-এর গন্ধে ঘর ভুরভুর করছে। অগত্যা খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লেগে গেলাম।

রুশ দেশের সর্বত্রই একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। দুধ ছাড়া চা এবং তার সঙ্গে লজেন্স জাতীয় মিষ্টি ও ফলমূল প্রায় সর্বত্র আমাদের পরিবেশন করা হয়েছে। এদেশে লজেন্স বা চকলেট খুব প্রিয় খাদ্যবস্তু। খাওয়ার পর্ব শেষ করে পরিচালিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা আড়াইটা। খালেদা জানালেন, আজ অত্যন্ত দেরী হয়ে গিয়েছে সুতরাং 'সিরামিক কারখানা' দেখতে আগামী কাল গেলেও চলবে।

দু' ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে পাঁচটায় আবার হোটেল থেকে বের হলাম। এবার চলেছি শহর প্রদক্ষিণে। প্রথমে গেলাম এখানকার সুবিখ্যাত মসজিদ দেখতে। সারা উজবেকিস্তানে এই মসজিদটি

Scanned with CamScanner

শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। মসজিদটির গঠনাকৃতি আধুনিক। আমাদের দেশের মসজিদগুলোর পরিবেশ খুব গম্ভীর ও শুভ্রতায় আচ্ছন্ন, আর এই মসজিদটির পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বড় বড় কাচের দরজা ও জানালা দিয়ে ঘরে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ফলে সেই গাম্ভীর্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সম্মুখেই বিরাট প্রাঙ্গণ, প্রায় তিন চার হাজার লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে। খালেদাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ধর্মের ব্যাপারে এদের কোন বাধা বাধকতা নেই। যার যেমন ভাবে খুশী আপন আপন ধর্ম পালন করতে পারে। তবে প্রাচীন বৃদ্ধের দল ব্যতীত আর কাউকে ধর্মের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী বা আগ্রহশীল মনে হয় না। কারণ সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথায়ও ধর্ম সম্পর্কে কোন শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা নেই। এদের নীতি হচ্ছে নাস্তিকতাবাদী। ফলে যুবক শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের প্রতি আগ্রহ নেই বরং নিস্পৃহ-ভাবটাই বেশী। এদেশে ধর্মটা নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখানকার সকল শিক্ষাই মার্কসবাদের মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং সরকারী প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদানের কোন প্রশ্নই উঠেনা।

এখান থেকে গেলাম একটি প্রাচীন মসজিদ দেখতে। এই মসজিদটি অতি প্রাচীন। এর বিরাট কাঠের দরজায় নানা রঙ্গের রঙ্গিন কাচ বসানো। প্রথম দৃষ্টিতে একে গির্জা মনে হয়। কারণ, এর গঠনাকৃতি অনেকটা গির্জার গঠনাকৃতির মত। আসলে এটা প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন।

এরপর শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোতে ঘুরে বেড়ালাম। পার্লা-মেন্ট ভবন ও তাসখন্দের বিখ্যাত যাদুঘর দেখলাম। এই যাদুঘরে হযরত ওসমান (রা:)-এর রক্তমাখা কোরাণ শরীফ সযত্নে রক্ষিত আছে। মসজিদে বসে খলিফা কোরাণ শরীফ তেলাওত করছিলেন, এমন সময় অজ্ঞাত দুষমন এসে পিছন দিক থেকে নির্মম আঘাত হানলো তপস্বীর

ঘাড়ের উপর। গড়িয়ে পড়লেন খলিফা খোলা কোরাণের উপর। আল্লার নাম করে তিনি চির বিদায় নিলেন পৃথিবীর অনাচার ও পাপাচার থেকে। চিরকালের জন্য রচিত হোল ইসলামের প্রথম কলঙ্কের ইতিহাস। রসুলের আদর্শ ভুলে শুরু হোল আত্ম-কলহ ও ক্ষমতার লড়াই।

সঙ্গিনী খালেদার মুখে শুনলাম, সিন্দবাদ গল্প-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি রক্ষিত আছে এই যাদুঘরে। এগুলো ছাড়া আরও বহু দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ আছে এখানে। নানা অমূল্য ও দুর্মূল্য সংগ্রহের প্রাচুর্য পরিপূর্ণ এই যাদুঘরটি। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, আমার সময় সংক্ষিপ্ত বলে এই যাদুঘরটির অভ্যন্তরে গিয়ে সবকিছু স্বচক্ষে দেখে আসবার সময় করতে পারলাম না। অন্যের মুখে শুনে স্বচক্ষে দেখবার আকাঙ্খা আরও বেড়ে গেল, কিন্তু আমি নিরুপায়।

রাত্রে আমাদের তাসখন্দ হোটেলের উল্টোদিকে অবস্থিত 'অপেরা হাউসে' ভ্যারাইটি শো দেখতে গেলাম। উজবেকিস্থানের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন কুশলী শিল্পীরা; নিজ নিজ জাতীয় পোষাক পরে জাতীয় নৃত্য পরিবেশন করলেন তাঁরা। বিখ্যাত গায়ক গীতিকাররা সুরেলা কণ্ঠে গান শুনালেন। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চললো এই বিচিত্রানুষ্ঠান। মোটামুটি অনুষ্ঠানটি ভালই লাগলো। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানের জাতীয় পোষাকে জাতীয় নৃত্যগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হোল রাত দশটায়। রঙ্গমঞ্চের বাইরে এসে দেখি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের হোটেল আর এই রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে একটি সুন্দর পার্ক আছে। সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই পথে নামলাম। পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে চললাম। রাত্রির স্বাভাবিক নির্জন নিরবতায় নিওন বাতির মাদকতার সঙ্গে ফোয়ারা হতে উৎক্ষিপ্ত পানির ঝির্ ঝির্ শব্দ অদ্ভুত এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সুদূরে ফেলে আসা

Scanned with CamScanner

সেই কোন্ ছেলেবেলায় নানী-দাদীর কাছে শোনা গল্পের পরী-রাজ্যের কথা মনে পড়ে যায়। ইচ্ছে হচ্ছিলো, এই পার্কে একটু বসে এই মাদকতার পরিবেশের মধ্যে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো কিন্তু বৃষ্টিটাই যত অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তু'মিনিট দাঁড়ানোরও উপায় নেই।

বিছানায় আশ্রয় নেবার পরও অনেকক্ষণ নিদ্রাদেবীর আগমন প্রত্যাশায় জেগে থাকতে বাধ্য হলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, এত বড় একটা দেশ কোন্ যাতুমন্ত্রের বলে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। ব্যাপক উন্নতির পরিচয় ছড়ানো রয়েছে এদের পথে-ঘাটে, ইমারতের চুড়ায়, লোকজনের পোষাকে ও কথাবার্তায়। এক যুগ আগেও যে দেশে কিছুই ছিল না একমাত্র কতকগুলি প্রাচীন ইমারত ছাড়া, আজ সেখানে আধুনিক ফ্যাক্টরী, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, কাচের কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতির কারখানা, লোহার কারখানা' সবই যেন আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আগেও এদেশে অজস্র তুলোকল ছিল কিন্তু কারখানা ছিল না। এখন তুলোকলের পাশাপাশি কাপড় তৈরীর আধুনিক কারখানা গড়ে উঠেছে। জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য আজ এরা দেশেই প্রস্তুত করছে, বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় না। তাই দেশের অর্থসম্পদ দেশেই থাকছে।

আর একটি সকাল হলো তাসখন্দে। আজকের সকাল যেন অনাবিল হাসি বিস্তার করে অভ্যর্থনা জানালো আমাকে। মনটা আনন্দে ছেয়ে গেল। পরিচারিকা চা রেখে গেল। সকাল বেলা এক কাপ চা না-খেলে মেজাজ ঠিক হয় না, কিন্তু আজকে যেন সেই চায়ের প্রতিও কোন আকর্ষণ অনুভব করলাম না। এই সুন্দর সকালে ঘরে বসে থাকতে মন চাইছিল না কিন্তু উপায় নেই। এখন আমি পথে নামতে পারি না, একেই তো আমি নবাগতা অতিথি, তাতে আবার শাড়ী পরিহিতা মহিলা। চা-র পেয়ালা

হাতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে দেহ মন জুড়িয়ে গেল। পরিষ্কার আকাশ, পথ এখনও জনগণের পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠেনি। চারিদিকে স্তব্ধ শান্ত পরিবেশ। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল মন।

সাড়ে দশটায় স্থানীয় একটি কারখানার নার্সারী দেখতে গেলাম। কর্মীমায়েরা কাজে যাবার আগে সন্তানকে এখানে রেখে যায়। আবার দিনান্তে বাড়ী ফেরবার পথে কোলে তুলে নিয়ে যায় প্রিয় সন্তানকে। প্রায় বিঘে তিনেক জমি নিয়ে এই নার্সারী। বিরাট প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে ছোট শিশুদের খেলবার জন্য কাঠের তৈরী খেলনা রয়েছে নানা প্রকারের। এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের ঠিক শিক্ষয়িত্রী বলা চলেনা। তাদের নার্স বলে অভিহিত করাই ভাল। যাদের মুখে ভাল করে কথা ফোটেনি, যারা ভাল করে হাঁটতে শেখেনি তাদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান। তাই স্নেহময়ী মায়ের অনুপস্থিতিতে এই শিক্ষয়িত্রীদের মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় শিশুকে মায়ের অভাব অনুভব করতে দেওয়া হয় না।

সারাদিন শিশুরা খেলা করে, দাপাদাপি করে, আনন্দে মেতে থাকে। শিশুদের মন ভোলানোর জন্য ঘরের ভিতরে দেওয়ালে নানারকম রঙ্গিন ছবি লাগানো আছে। শুধু ছবি আর ছবি। একটা ঘরে শুধু ফুলের গাছ। দেখে মনে হচ্ছে বাইরে থেকে গোটা বাগানটাই যেন ঘরের ভিতর তুলে আনা হয়েছে। বড় একটা ঘরে ধুলোবালি আর কাঠের খেলনা রয়েছে। কয়েকটি শিশু মনের আনন্দে ধুলো মাখছে আর হাসছে। ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাদের আপন মনে খেলা করার জন্য। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু ঐ ধুলোবালির পাশে। তখন সযত্নে তার ধুলোবালি ঝেড়ে কোলে তুলে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় পাশের ঘরে ছোট খাটের নরম বিছানায়। শিশু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, মায়ের কোলের উষ্ণতা অনুভব করে আর মুখে তার ফুটে ওঠে অনাবিল হাসি।

তিন বছর পার হবার পর এরা যাবে পাশের কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে। এখানকার শিক্ষাদানের পদ্ধতিও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শিশুদেরকে বই-এর পাতা মুখস্ত করতে হয় না ; মাষ্টার মশায়ের চোখ রাঙ্গানীর ভয়ও নেই। ক্লাস ঘরের সারা দেয়ালে অসংখ্য ছবি। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মরুভূমি, বন-জঙ্গল প্রাচীন জীবজন্তু সবরকম ছবিতেই পূর্ণ সে দেয়াল। এই স্কুলেই একটা বড় হলঘর আছে যেখানে ছাত্রছাত্রীদেরকে পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মাধ্যমে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হয়। তখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে ওঠে আফ্রিকার বিপদসঙ্কুল জঙ্গল অথবা হিমালয়ের তুষার ঝড়। আবার কখনও ভেসে ওঠে সাহারার সুদূর প্রসারিত বালির মরুভূমি। কখনও বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে তাদের কানে আঙ্গুল দিতে হচ্ছে। এমনি করে প্রত্যেক ব্যাপারেই তাদের প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান দান করা হচ্ছে। ফলে এক বার তারা যেটা শিখছে, সেটা আর তুলে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। কোনরকম বাধ্য-বাধকতা নেই। খেলা ধূলা ও ছবি দেখার ভিতর দিয়েই নিজের অজ্ঞাতে তারা শিক্ষা লাভ করছে। পূর্বেই বলেছি, সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বত্র শিশুরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী স্বাধীন এবং সবচেয়ে বেশী আদরণীয়। তাইসব ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি।

শিশুদের রাজ্যে অনাবিল আনন্দের মধ্যে কেটে গেল অনেকটা সময়। শিশুদের এই রাজ্য ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু খালেদা বার বার তাগাদা দিচ্ছে, বারটার সময় আমাদের পৌঁছতে হবে সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক অফিসে। উজ্‌বেকিস্তানের কতিপয় গণ্যমান্য মহিলা সেখানে সমবেত হয়েছেন আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও শিশুদের এই আনন্দ-ভবন থেকে বিদায় নিতে হলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমাদের

গাড়ী এসে থামলো উজবেক সোভিয়েট সোসালিষ্ট রিপাবলিক অফিসের সম্মুখে। হ্যাঁ, গুরুগম্ভীর স্থান বটে। মোটা ভারী থামগুলোই এর গুরুত্ব বহন করছে। খালেদা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল দোতালায়। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী প্রথমে ছোট কামরায় কোট খুলে অপেক্ষমানা পরিচারিকার হাতে সমর্পণ করলাম, তারপর প্রধান কামরায় প্রবেশ করলাম। ঘরের মধ্যে প্রায় পনের জন নানা বয়সের মহিলা বসেছিলেন ; আমাকে প্রবেশ করতে দেখেই সবাই এক-সঙ্গে এগিয়ে এলেন। প্রথমেই পরিচয় হোল উজ্‌বেকিস্তানের স্বনামধন্যা মহিলা কবি মিসেস জুলফিয়ার সঙ্গে। তিনি যে শুধু একজন খ্যাত কবি তাই নয়, পার্লামেন্টের সদস্যা এবং "তাসখন্দ মহিলা" নামক পত্রিকার প্রধানা সম্পাদিকা। তিনি করিতকর্মা মহিলা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর যে সকল মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সমাজ সেবিকা, লেখিকা এবং পার্লামেন্টের সদস্যাও ছিলেন।

মিসেস জুলফিয়া জানালেন যে, উজ্‌বেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াদগার নাসিরিজিনভা বিশেষ জরুরী কাজ বশতঃ এখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। সেজন্য তিনি যে অত্যন্ত দুঃখিত, একথা আপনাকে জানাতে বলেছেন।

অন্য আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আমাদের দেশ সম্পর্কে খুব কৌতুহল প্রকাশ করলেন। আমাদের দেশে মহিলাদের কি রকম সুবিধা অসুবিধা আছে সে সম্পর্কে জানবার জন্য তাঁরা খুবই উৎসুক। আমাদের দেশে আইন পরিষদে ও জাতীয় পরিষদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে শুনে তাঁরা আশ্চর্য হলেন। রুশদেশের মহিলারা সাধারণ নির্বাচনে সকলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিতা হয়ে আসেন পরিষদে।

আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে জানতে পারলাম, যদিও উজ্‌বেকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে তবু তাদের মধ্যে

একাধিক বিবাহ বা তালাকের প্রচলন নেই। অবশ্য প্রাচীন প্রাচীনাদের মধ্যে এখনও খুবই ধর্মভীতি আছে। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও এখানে বোরখা পরার প্রচলন ছিল।

এদের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগলো। এদেশের মহিলা-দের সম্পর্কে মোটামোটি খবর জানা গেল। বিদায় নেবার আগে মিসেস জুলফিয়া আমার হাতে তুলে দিলেন একটা সিল্কের কাপড়ের প্যাকেট, একটি টুপি এবং এ্যালবাম। এই কাপড় এবং টুপি তাসখন্দের জাতীয় নিদর্শন। এই বিশেষ ধরণের সিল্ক এখানে তৈরী হয় এবং এরই কাপড় এরা পরে গৌরব বোধ করে। আর এখানকার ছেলেবুড়ো সবাই এই টুপি মাথায় দেয়। উজবেকিস্তানের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের ছবিতে ভরা তাঁদের দেওয়া সুদৃশ্য এ্যালবামটি। উপহারগুলো সাদরে গ্রহণ করে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

বিকেল পাঁচটায় পৌঁছালাম তাসখন্দের বিখ্যাত সিরামিক ফ্যাক্টরী দেখতে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এই ফ্যাক্টরী অবস্থিত। ফ্যাক্টরীর অনেকগুলো বিভাগ। একটি ঘরে শুধু চার কেট্‌লী তৈরী হচ্ছে, আরেকটিতে হচ্ছে বাটী। আবার কোনটিতে চার পেয়ালা, নানারকম খেলনা, ফুলদানী, প্লেট। ঘর সাজানোর নানা-রকম উপকরণও তৈরী হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ডিজাইন ও ফুল লতাপাতা আঁকা হয়। কতকগুলো নক্সা দক্ষ শিল্পী তাঁর নিপুণ হাতে এঁকে দেয় পাত্রের গায়ে, আবার কতকগুলো নক্সা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও আঁকা হয়। এখান থেকেও বহু উপহার গ্রহণ করতে হোল। মেয়েরা কি অবলীলাক্রমে যন্ত্রপাতির সাহায্যে নানারকম নক্সা আঁকছে পাত্রের গায়ে দেখে অবাক হতে হয়।

সিরামিক ফ্যাক্টরী থেকে বের হয়ে খালেদাকে বললাম, তাস-খন্দকে ভালভাবে জানতে ও দেখতে চাই আজ। কারণ আজই আমার তাসখন্দে শেষদিন। আগামী কাল মস্কো রওয়ানা হব। সুতরাং চলো একটু ঘুরে ফিরে দেখা যাক। এদিক ওদিক আসা

যাওয়ার দু'দিন ধরে যে তাসখন্দকে আমি দেখেছি তাতে আমার মন ভরেনি।

ছোটবেলায় তাসখন্দ সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছি, বড় হয়েও পড়েছি কত কথা এই দেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা। সোভিয়েট ইউনিয়নের সপ্তম বৃহত্তর শহর এই তাসখন্দ। এর জনসংখ্যার পরিমাণ হচ্ছে মোট ৯,৩৬,০০০। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী তুলোর কারখানা এই দেশে আছে। এছাড়া এদেশের গোলাপ ফুল সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য পিপাসু লোকদের মন হরণ করেছে।

তাসখন্দের বিখ্যাত কবি আলীশির নভোই-এর নামানুযায়ী একটি রাস্তার নাম করণ হয়েছে আলীশির নভোই রোড। বিজলী বাতির আলোকে আলোকময়, চোখে ধাঁধাঁ লাগে। আলীশির নভোই উজবেকিস্তানের একজন দার্শনিক কবি ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। কবির স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। তাই আজ দেশবাসী অন্তর থেকে তাঁকে স্মরণ করছে, ঢেলে দিচ্ছে সম্মানের ডালি তাঁর স্মরণে। তাই শুধু রাস্তার নামকরণ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, করেছে আলীশির পাঠাগার, আলীশির রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চটি অপূর্ব্ব কারুকার্যে এবং বিশালত্বেও আপন শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা বহন করে চলেছে। আলীশির নভোই রোডের মাঝখানে তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি আছে। এই মূর্তিটির পরণে লম্বা চোগা (যা আমাদের দাদারা পরতেন) আর মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, প্রকাণ্ড মূর্তি। এক নজরে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

গোর্কী রোড, কার্ল মার্কস রোড সবই আলোয় ঝলমল করছে। আর এই সব রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট অট্টালিকা। তাসখন্দ রিজিওনাল এক্‌জিকিউটিভ কমিটির অট্টালিকা, উজবেকি-স্তানের কৃষি বিভাগের অট্টালিকা, নভোই থিয়েটার, সবই তাকিয়ে দেখবার মত। এর-মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হলো

Scanned with CamScanner

নভোই থিয়েটার। এর অভ্যন্তরে গোটা দেয়ালটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যে পূর্ণ। অসাধারণ সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত এর ছাদ এবং দেয়ালের নক্সা এক মুহূর্তে দর্শকের মন হরণ করতে সক্ষম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। এর খাঁচকাটা নক্সার ধরণটা আমাদের দেশের প্রাচীন অট্টালিকার গায়ে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। সূক্ষ্মতার দিক থেকে এর জুড়ি নেই। অট্টালিকার গায়ে এত সূক্ষ্ম কাজ সত্যই আজকের দর্শককে আশ্চর্যান্বিত করে দেয়।

তাসখন্দ হাউস অফ কালচার অফ মিল ওয়ার্কস-এর অট্টালিকাটিও দেখবার মত। উজ্‌বেকিস্তানের পার্লামেণ্ট ভবন, উজ্‌বেক সরকারের ভবন, তাসখন্দের বিখ্যাত কম্‌সমোল স্কোয়ার, হামজা ষ্ট্রীট এবং রিক্রিয়েশান পার্ক দেখলাম। এগুলোর মধ্যে কম্‌সমোল স্কোয়ারটি সৌন্দর্যের দিক থেকে একেবারে অনন্য। চারদিকে নানা রঙয়ের অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে, এরই মাঝখানে ফোয়ারা থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে পানির শতধারা। এক দৃষ্টিতেই গল্পের মায়ালোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকের রশ্মি ফোয়ারার উৎক্ষিপ্ত ধারার উপর বিচ্ছুরিত হয়ে সেখানে নানারঙের আলো সৃষ্টি করেছে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মাদকতা মাখানো পরিবেশটি। কর্মক্লান্ত মানব এই মায়াজগতের মাঝে এদিক ওদিক বসে আপন ক্লান্তি দূর করে নূতন করে উৎসাহ সঞ্চয় করে নিচ্ছে আগামী কালের জন্য। রাস্তার দুধারে বড় বড় ওক্‌বৃক্ষ প্রহরারত শান্ত্রীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন সব সময় চোখ রাঙিয়ে পথচারীকে ভয় দেখাচ্ছে, খবরদার নোংরা করোনা, নষ্ট করোনা, এই সৌন্দর্য এই গাম্ভীর্য। সারা শহরে টহলদিয়ে, নানা পথ ঘুরে তাসখন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করে ফিরে এলাম হোটেলে রাত্রি সাড়ে ন'টায়। ক্লান্তি বোধ করছিলাম তাই সামান্য যা গোছগাছ করবার ছিল পড়ে রইলো আগামী কাল সকালের অপেক্ষায়। অবশ্য আগামী কাল সকালেই মস্কোর পথে

তাসখন্দের বিখ্যাত সিরামিক ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করছেন লেখিকা। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ফ্যাক্টরীর বিভাগীয় প্রধান জনৈক মহিলা।

টিউব রেলষ্টেশনে অপেক্ষমানা লেখিকা ও তাঁর রুশ সঙ্গিনী

রওয়ানা হতে হবে। তা'হোক আমার তেমন কিছু গোছানোর নেই, সুতরাং সময়ের অভাব হবেনা।

আটাশে নভেম্বর। ফিরে চলেছি আজ মস্কোর পথে। তাসখন্দ বিমান বন্দরের প্রবেশ পথটা ভারী সুন্দর। পথের মাঝে ফুলের কেয়ারী আর তাতে অজস্র রঙীন ফুলের সমারোহ। মনে হয় বিদায়ী যাত্রীদের শুভকামনা জানিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে প্রস্ফুটিত ফুলের গুচ্ছ।

আমাদের বিমানটা একটুও দেরী না করে হুস্ করে উপরে ওঠে গেল, তারপর আকাশ সাগরে ডানামেলে উড়ে চললো। আজকের আকাশটা বেশ পরিষ্কার। কাজেই, নিচের পৃথিবী এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো মাথাতুলে সাবধান বাণী শোনাচ্ছে, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না, ক্ষতি হবে। খানিকটা যেতেই একটা ছাই রঙের পাহাড়ের দিকে মারিয়া ত্রিজুনোভা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—সোলেমান পর্বত। এই সেই সোলেমান পর্বত ছোটবেলায় যার গল্প শুনেছি। মনটা উত্তেজনায় ভরে গেল। এই সোলেমান পর্বতকে নিয়ে বহু কাহিনীই আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভাল করে হু'চোখ মেলে দেখে নিচ্ছি। পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে আজকের বাস্তবের মিল খুঁজে বেড়াচ্ছে আমার দৃষ্টি। সোলেমান পর্বত খোদার নূরে অর্থাৎ জ্যোতিতে সামান্য প্রকাশ পেয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল; তাই তো আজও এই পর্বত ছাইরঙ নিয়ে মাথা উঁচু করে সারা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করছে অতীতের গৌরবময় কাহিনী। সোলেমান পর্বতের ভস্ম গুঁড়ো চোখে ব্যবহার করা হয় সুর্মারূপে। আমাদের দেশে এটা খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। চোখের জন্য এই গুঁড়ো নাকি খুবই উপকারী। তাছাড়া সোলেমান পর্বতের গুঁড়ো—সুতরাং তার সঙ্গে পুণ্য সঞ্চয়ের একটা গোপন অনুভূতি জড়িত আছে।

বেলা বারটায় আমরা মস্কো পৌছালাম। সোভিয়েট মহিলা সংস্থার ডেপুটি চীফ নীনা ভরোনীনা বিমান বন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নীনা জানালেন, আজকে আমাকে উপলক্ষ্য করে আমাদের পাকিস্তান দূতাবাসে একটি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আপাততঃ আর কোন প্রোগ্রাম নেই। হাতে এখন যথেষ্ট সময় আছে, সুতরাং যদি তাঁদের পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখে দিই, তাঁরা খুব খুশী হবেন। আমি আপত্তি করবার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু লেখাটা তো রাত্রে বসে লেখা যাবে, আপাততঃ যে সময়টুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটা হোটেলের ঘরে বসে অপচয় করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। মনটা কেবলই বলছে এখনও অনেক কিছু দেখা বাকী রয়েছে, পথে বেরিয়ে পড়ো। মস্কোর বিস্ময়কর টিউব ট্রেন আমার দেখা হয়নি। ভ্রমণ করা হয়নি এই ট্রেনে। বিলেতের টিউব ট্রেন অর্থাৎ মাটির তলায় চলন্ত রেলগাড়ী সারা পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কিছুকাল ধরে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে যে রুশ দেশের, বিশেষ করে মস্কো শহরের মাটীর তলায় যে আধুনিকতম রেলগাড়ী চলাচল করছে সেগুলো নাকি গতি ক্ষিপ্রতায়, বাহ্যিক সৌন্দর্যে এবং অন্যান্য সুবিধার দিক থেকে হার মানিয়েছে বিলেতের রেলগাড়ীকে। সুতরাং এই আশ্চর্যজনক যান্ত্রিক মহাবীরকে দর্শন না করে এবং ওতে করে খানিকটা পথ ভ্রমণ না করে গেলে আমার তৃপ্তি হবেনা, তাছাড়া আমার মস্কো ভ্রমণ কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি দ্বিধা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে মারিয়ার কাছে আমার এই ইচ্ছার কথাটা ব্যক্ত করে ফেললাম।

মারিয়া সানন্দে আমার ইচ্ছা পূরণে সম্মত হোল—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, খাবার পর তৈরী হয়ে থেকো। আমি মার্ককে সংগে নিয়ে তোমার ওখানে হাজির হবো তিনটায়।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই আমার। করবার মত আর কোন

কাজও হাতে নেই। কাজেই খাওয়া শেষ করেই আমি তৈরী হয়ে বসে আছি আর বার বার ঘড়ি দেখছি কখন তিনটা বাজবে। চঞ্চল কৌতূহলী মনকে শাসন করে অন্য কাজে নিয়োজিত করা যায় না। ভেবেছিলাম যতক্ষণ ওরা না আসে প্রবন্ধটারই দু'পাতা লিখে ফেলি। কাগজ কলম নিয়ে বসেও পড়লাম, কিছুতেই লেখা আসছে না। দু'চার বার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে শেষে কাগজ কলমকে মুক্তি দিলাম এখনকার মত। তিনটা বাজতে তো আর বেশী বাকি নেই, ওরা এখনও আসছে না কেন? এই তো ওরা এসেছে। তাকিয়ে দেখি ঘড়ির কাঁটা ঠিক তিনটার ঘরে—বাব্বাঃ এত পাংচুয়াল!

মারিয়াকে তাড়া দিলাম, চলো—চলো, তাড়াতাড়ি করো।

আমার কথা শুনে মারিয়া হেসে ফেললো—টিউব ট্রেন মস্কো ছেড়ে যাচ্ছে না তো!

'টিউব ট্রেন মস্কো ছেড়ে যাচ্ছে না, কিন্তু আমি তো মস্কো ছেড়ে যাচ্ছি আগামী কাল, সুতরাং এটা যাতে বাদ না পড়ে তাই আমার এত তাড়া।'

মেট্রো ট্রেনের ষ্টেশনটা আমাদের হোটেল বার্লিন থেকে বেশী দূরে নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা ষ্টেশনে পৌছে গেলাম। ভিতরে ঢুকে কাউন্টারে গিয়ে মারিয়া পাঁচ কোপেক অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় পাঁচ পয়সা দিয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা করে টিকিট কাটলো। যেখানেই যাও, কাছেই অথবা দূরে যাও, ঐ পাঁচ কোপেক লাগবে, ওর বেশী নয় কমও নয়। এবার বৈদ্যুতিক সিঁড়ির ধাপে গিয়ে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি আপনা আপনিই নেমে যাচ্ছে নিচে পাতালের দিকে। যাত্রীদের খুব ভীড়। শুনেছি প্রত্যহ প্রায় আড়াই লক্ষ লোক এই পথে যাতায়াত করে। দ্রুততার জন্য এবং সস্তার জন্যও বটে যাত্রীরা সাধারণতঃ এই টিউব ট্রেনই বেশী পছন্দ করে। সিঁড়িতে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সিঁড়ি নেমেই চলেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবীর অতল গহ্বরে কোন পাতাল পুরীতে

Scanned with CamScanner

প্রবেশ করছি। অবশেষে সিঁড়ি থামলো পাতালপুরীর রাজপ্রাসাদের দুয়ারে। রাজপ্রাসাদই বলবো—অপূর্ব অভাবনীয় তার সৌন্দর্য। গোটা ষ্টেশনটাই সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী। মাঝে বড় বড় থাম শান্ত্রীর গাম্ভীর্য নিয়ে প্রহরায় দাঁড়িয়ে আছে। নিওন আলোর উজ্জল আভায় হাস্যোজ্জ্বল মনে হচ্ছে ষ্টেশনটাকে। পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে ট্রেন এসে থামছে। আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি বৈদ্যুতিক দরজা খুলে যাচ্ছে। যাত্রীর ওঠা নামা শেষ হলে আবার দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও একটা কামরায় উঠে বসলাম। ট্রেনের কামরার দুপাশে পুরু গদী মোড়া আসন, বাসের মত মাঝখানে মাথার উপর লম্বা রড্। যারা বসবার জায়গা পায়নি তারা ঐ রড্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনের গতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র, তাই ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য ঐ রডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেন ছাড়বার আগে মাইকে ষ্টেশনের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। ট্রেনের ভিতরটা পরিচ্ছন্নতায় ঝল্মল্ করছে। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য আলাদা কামরার ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে চমৎকার ব্যবস্থা। শুনেছি সোভিয়েট সরকার তাদের এই মেট্রো ট্রেনের মাধ্যমে এই কথাটাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, তাদের দেশকে ভবিষ্যতে সকল ক্ষেত্রেই এমনিতর ক্ষিপ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও নিপুণতায় সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার পরিকল্পনা আছে। তারই আভাস দেওয়া হয়েছে এই মেট্রো ট্রেন ও এর জন্য বিশেষভাবে গঠিত ষ্টেশন গুলোতে। পর পর কয়েকটা ষ্টেশন পার হয়ে গেল। অবশেষে লেনিনিস্কি গোরী নামক ষ্টেশনে ট্রেন থামতেই আমরা নেমে পড়লাম। মার্ক গ্যানলীন নেমেই নিজের কাজে লেগে গেলো। খুট খুট করে দুটো ছবি তুলে নিল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আবার ফিরতি ট্রেনে করে ফিরে এলাম। ষ্টেশনের দু'দিকে দুটো ট্রেনের ব্যবস্থা, যাওয়া এবং আসার জন্য। সুতরাং যাত্রীদের মোটেই কষ্টভোগ করতে হয় না।

সাড়ে ছটায় পাকিস্তানের দূতাবাসের মিনিষ্টার জনাব জিয়াউদ্দীন সাহেবের ১৯ নং কুটোকো ভসিক প্রসপেক্টস্থ বাসায় পৌঁছালাম। বাসাটা খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা অসুবিধা হয়েছিল। এখানকার সন্ধ্যা ছটার সময় মনে হয় গভীর রাত। তার উপর আবার প্রচণ্ড শীত, বাংলা ভাষায় যার নাম বাঘা শীত। অবশ্য বাংলা দেশ কখনও এই শীতের দেখা পায়নি, না দেখেই নামকরণ হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে। গাড়ীথেকে নেমে বাড়ীর দরজার ভিতরে ঢুকতে যে মুহূর্তটুকু লাগলো সেই সময়টুকুর মধ্যে শীত হাড় কাঁপিয়ে তুললো। মস্কোবাসী আরও কয়েকজন পাকিস্তানীর সঙ্গে দেখা হোল এখানে। জিয়াউদ্দিন সাহেবের আমন্ত্রণে এঁরাও এসেছেন। এঁদের মধ্যে দু'জন ডাক্তার, গবেষণা করার জন্য তাঁরা এসেছেন এখানে। পাকিস্তানের দূত মিঃ আরশাদের সঙ্গে পরিচয় হলো।

সাড়ে নয়টায় ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসবেনা। তাই মারিয়াকে বিদায় দিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম ওদের পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতে। মারিয়াও যাবার সময় বেশ খানিকটা উদ্বেগ প্রকাশ করে গেল। ওর মনে সন্দেহ আছে আমি যাবার আগে লেখাটা শেষ করতে পারবো কিনা। দোষ নেই তার। এতদিনের মধ্যে যাকে একটা ছত্রও সে লিখতে দেখেনি আজ যাবার বেলায় লেখাটা সে দিয়ে যাবে এ ভরসা তার আসবে কোথা থেকে? আমার যেমন স্বভাব তাতে ঐ একেবারে শেষ মুহূর্ত ছাড়া আমার কোন কাজ হয়ে ওঠেনা। শুধু বার বার মনে হয় যথেষ্ট সময় আছে, তাড়াহুড়া করবার কোন প্রয়োজন নেই। যাক লেখাটা দাঁড় করাতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লাগলো। লিখতে লিখতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘর পার হয়ে বারটার ঘর ছুঁই ছুঁই করছে খেয়ালই করিনি। এবার ঘুম পাচ্ছে, সুতরাং এখন ঐ পর্যন্তই থাক, আগামী কাল সকালে বাকীটুকু করলেই হবে।

উনত্রিশে নভেম্বর। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আমার মনে পড়লো

Scanned with CamScanner

সোভিয়েট ইউনিয়নে আজ আমার শেষ প্রবাসকাল। আজ বিকাল চারটেয় সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিদায় নিয়ে যাব লণ্ডনের উদ্দেশ্যে।

শয্যা ত্যাগ করে প্রথমেই রাত্রের লেখাটা নিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেটা সমাপ্ত হোল। এই বার জিনিষপত্র গোছানো দরকার। এই ক'দিনের ভ্রমণে টুকিটাকি জিনিষপত্র অনেক জমেছে। যেখানেই গিয়েছি কিছু-না-কিছু উপহার গ্রহণ করতে হয়েছে। এখন সেইগুলো বাক্সে তুলতে গিয়ে পড়লাম মহা সমস্যায়। এত জিনিষ ভরবো কোথায়? কোন কিছু যে ফেলে যাব তাও মন চায় না, সবই আমার প্রিয়।

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠ্‌লো—নীনা ভরোনীনা জানতে চাচ্ছে লেখাটা আমার তৈরী হয়েছে কিনা। একেবারে রেডি হয়ে আছে শুনে খুব খুসী হোল। তারপর জানালো, লেখা বাবদ আমি নাকি বেশ কয়েক রুবল রোজগার করে ফেলেছি, সুতরাং আমার যদি কিছু কেনবার প্রয়োজন থাকে তাহলে সে এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। কথা শুনে আমি তো অবাক। এখানকার নিয়মকানুন আমার জানা ছিলনা। লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে সেটা আমাকে আগে বলা হয়নি।

আধঘণ্টার মধ্যেই নীনা উপস্থিত হোল। লেখাটা নিয়ে আমাকে তৈরী হতে বলে সে চলে গেলো পত্রিকার অফিসে। আরও আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে আমার হাতে তুলে দিলো অনেকগুলো রুবল। আবার আশ্চর্য হবার পালা। ঐটুকু লেখার জন্য এত-রুবল! আমাদের দেশের লেখকগোষ্ঠীর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। লেখা বিক্রি করে কালেভদ্রে যে পয়সা পাওয়া যায় সেটা মোটেই সম্মানজনক নয়। অথচ এদেশে এক এক জন লেখক অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি, তাঁর স্থান সবার উপরে।

নীনা ভরোনীনা জানালো, এই রুবলগুলো এই দেশেই খরচ করে যেতে হবে, এটাই হচ্ছে তাদের দেশের নিয়ম।

কিনতে তো হবেই কিন্তু একি বিদঘুটে নিয়ম। কেন বাবা, আমি তো তোমার দেশের অর্থ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিনা। আমি রীতিমত পরিশ্রম করে উপার্জন করেছি, সুতরাং এখন এটা আমার নিজের অর্থ। আমি যেখানে খুসী নিয়ে যাব, যেখানে খুসী খরচ করবো।—না, তা নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ম নেই।

রেগে গিয়ে বললাম, তোমাদের দেশের নিয়ম খুব খারাপ, এটা অন্যায় জুলুম।

কথা শুনে নীনা হেসে ফেললো—আমার দেশ ছেড়ে যাবার আগে এমন ভাবে গালাগাল দিয়ে যাবে?

নীনার কথায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে নীনা তাড়া লাগালো, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।

আমাকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে গাড়ী এসে থামলো 'সোভিয়েট ওম্যান' পত্রিকার অফিসে। এতক্ষণে নীনা জানালো যে, আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্য আজ এখানে সামান্য আয়োজন করা হয়েছে, সবাই আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

পত্রিকাটির প্রধানা সম্পাদিকা মারিয়া আফ্‌সানিভা জরুরী কাজে মস্কোর বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। যাবার আগে আমাকে বিদায় দেবার সব ব্যবস্থা করে গিয়েছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি নিজে উপস্থিত থাকতে পারলেন না বলে। একথা জানালেন সহকারী সম্পাদিকা মার্থা ইনচুক। ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমার মনটা খারাপ লাগলো। অনেক যত্ন নিয়েছেন তিনি। আমার সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা তো আসলে তিনিই করেছিলেন।

সামান্য কিছু জলযোগের পর মার্থা ইন্‌চুক আমার গলায় পরিয়ে দিল মস্কোর দামী পাথরের এক ছড়া হার। তাদের পক্ষ থেকে এই উপহার আমাকে গ্রহণ করতে হোল। এদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি, কৃতজ্ঞ বোধ করেছি। তাই আজ বিদায়

নেবার ক্ষণে মনটা বার বার বিমর্ষতায় ভরে যাচ্ছে। একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম।

আবার এসে ঢুকলাম মস্কোর বিখ্যাত দোকান, গুম-এ। প্রথমেই একটা স্যুটকেশ কিনে নিলাম উপহারগুলোর জন্য। বাকী রুবলগুলো খরচ করবো কেমন করে। পয়সা কেমন করে খরচ করবো এ কথা চিন্তা করছি ভাবতেই আশ্চর্য লাগলো। এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। কি কিনবো বুঝতে পারছিনা। আমি এখান-থেকে লণ্ডন, প্যারিস, জার্মান যাবো। ইউরোপটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা আছে। সুতরাং সৌখীন দ্রব্য কিছু কেনবার থাকলে ঐ সব দেশ থেকেই কেনা ভাল। তাহলে এই পয়সা দিয়ে কি করি? হঠাৎ মনে পড়লো মেয়েটা আসবার সময় বলেছিল সব দেশের পুতুল সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে। কথাটা নীনার নিকটে ব্যক্ত করতেই নীনা জানালো, সবরকম পুতুল কিনতে হলে 'বাচ্চো কি দুনিয়া' জাতস্ কিমিওর-এ যাওয়াই ভাল।

কেনা কাটা শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম বেলা একটায়। আর মাত্র দু'ঘণ্টা সময় আছে হাতে। তিনটের সময় বেরিয়ে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। নীনাকে সঙ্গে নিয়ে আগে খাবার ঘরে পৌছালাম।

মারিয়া গ্রিজুনোভা ও মার্কগ্যানকীন এলো ঠিক তিনটায়। ফুলের তোড়া গুঁজে দিল আমার হাতে। ওদের সঙ্গে বিমান বন্দরে পৌছালাম। সেখানে পাকিস্তান দূতাবাসের মিঃ ও মিসেস জিয়াউদ্দিন, মার্থা ইনচুক, রোজা বাইমুরাতওরা—সবাই উপস্থিত। ফুলের মালা ও তোড়ার স্তূপ জমলো। সবাই আজ বিদায় জানাবার জন্ম উপস্থিত। শেষ ঘোষণা শোনা গেল। মার্ক এবং মারিয়া অনুরোধ জানালো,—আবার আসবার চেষ্টা করবে বলো।

—নিশ্চয় করবো। তোমাদের সঙ্গে যে সময় কাটিয়েছি সেটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অত্যন্ত ভাল লেগেছে তোমাদের আতিথ্য। তোমাদের আন্তরিকতায় আমি সত্যই মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ।

—না—না, ও সব বলে লজ্জা দিওনা। কতটুকুই বা আমরা করতে পেরেছি।

বিমানে আরোহণ করার জন্য তাড়া দিল বিমান বন্দরের কর্ম-চারী। সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বিমানে আরোহণ করলাম। নিরাপত্তা-বন্ধনী এঁটে বসলাম। জানালা দিয়ে আর একবার শেষবারের মত দেশটাকে দেখে নিই যতটা দেখা যায়।

সতেরো দিন এদেশে বাস করে গেলাম। এই সতেরো দিন ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি। দেখেছি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, জানতে চেষ্টা করেছি এদেশবাসীকে। অনুধাবন করেছি এদেশের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস। মিশেছি বহুলোকের সঙ্গে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করেছি তাদের জাতীয় চরিত্রকে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমি কতটুকু দেখেছি। আমি যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা জেনেছি, তাতে কি আমার সম্পূর্ণ ভাবে জানা হয়েছে? পূর্ণ ভাবে দেখতে পেয়েছি? একটা দেশের অন্তরকে জানতে হলে মাত্র সতেরো দিন কি পর্যাপ্ত সময়? তাই তো আমাদের কবির কথা মনে পড়ে—

"এ শুধু বালু বেলায়
ঝিনুক কুড়াবার খেলা॥"